মিসির আলি

UNSOLVED

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

ছবি........................... 2

ফ্লুট ফ্লাই 21

মাছ........................... 42

রোগভক্ষক রউফ মিয়া........................ 52

লিফট রহস্য 70

সিন্দুক........................... 89

সোনার মাছি 108

ছবি

তখন আমি উত্তরায় আস্ত একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া করে একা থাকি। ব্যক্তিগত কারণে স্বেচ্ছা নির্বাসন বলা যেতে পারে। রান্নাবান্না করার জন্যে একজন বাবুর্চি রেখেছিলাম। তৃতীয় দিনে সে বাজার করার টাকা-পয়সা নিয়ে বের হলো, আর ফিরল না। চাল-ডাল-তেল অনেক কিছু কিনতে হবে বলে সে পনেরোশ' টাকা নিয়েছিল। পরে দেখা গেল সে এই টাকা ছাড়াও আমার হাতঘড়ি, চশমার খাপ এবং টেবিলে রাখা রাজশেখর বসুর চলন্তিকা ডিকশনারিটাও নিয়ে গেছে। ডিকশনারি নেবার কারণ কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। যে বাজারের ফর্দে কাচামরিচের বানান লেখে কাছা মরিচ, চলন্তিকা ডিকশনারির তার প্রয়োজন থাকলেও কাজে আসার কথা না। আমি ঠিক করে রাখলাম, মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে প্রসঙ্গটা তুলব। চলন্তিক ডিকশনারি সে কেন নিয়েছে এই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দিতে পারবেন। এরপর দু'বার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দু'বারই ভুলে গিয়েছি। তৃতীয়বার যেন এই ভুল না হয় তার জন্যে লেখার টেবিলে রাখা নোটবইতে লাল বলপয়েন্টে লিখে রেখেছি–

মিসির আলি
চলন্তিকা চুরি রহস্য

বর্ষার এক সন্ধ্যায় মিসির আলি উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে মাঝারি সাইজের টকটকে লাল রঙের একটা ফ্লাস্ক। তিনি বললেন, চা এনেছি। চা খাবার জন্যে তৈরি হন। বলেই তিনি পাঞ্জাবির

পকেট থেকে দুটা ছোট ছোট গ্লাস বের করলেন। আমি বললাম, বাসায় কাপ ছিল, পকেটে করে গ্লাস অ্যানার দরকার ছিল না।

মিসির আলি বললেন, যে চা এনেছি তা দামি চায়ের কাপে খেলে চলবে না। রাস্তার পাশে যেসব টেম্পরারি চায়ের দোকান আছে তাদের কাপে করে খেতে হবে। এবং দাঁড়িয়ে খেতে হবে।

আমি বললাম, দাঁড়িয়ে খেতে হবে কেন?

মিসির আলি বললেন, ঐ সব দোকানে একটা মাত্র বেঞ্চ থাকে। সেই বেঞ্চে কখনো জায়গা পাওয়া যায় না। দাঁড়িয়ে চা খাওয়া ছাড়া গতি কী? আরাম করে যে চা-টা শেষ করবেন। সেই উপায়ও নেই। ব্যস্ততার মধ্যে চা-পান শেষ করতে হবে। কারণ গ্রাসের সংখ্যা সীমিত। অন্য কাস্টমাররা অপেক্ষা করছে।

শিশুর পিতা শিশুর অন্তরে লুকিয়ে থাকে- কথাটা যেমন সত্যি তেমনি সব বড় মানুষের মধ্যে একজন শিশু লুকিয়ে থাকে তাও সত্যি। মিসির আলির মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিশুটির কারণে আমাকে ফ্লাস্কের চা দাঁড়িয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে খেয়ে শেষ করতে হলো। মিসির আলি বললেন, প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের জন্যে পরিবেশ আলাদা করা। ভাপা পিঠা খেতে হয় উঠানে, চুলার পাশে বসে। চিনাবাদাম খেতে হয়। খোলা মাঠে, পা ছড়িয়ে অলস ভঙ্গিতে। মদ খেতে হয় কবিতার বই হাতে নিয়ে।

তাই না-কি?

মিসির আলি বললেন, আপনাদের কবি ওমর খৈয়াম সেই রকমই বলেছেন।

অল্প কিছু আহার মাত্র আরেকখানি ছন্দমধুর কাব্য হাতে নিয়ে। মিসির আলিকে নিয়ে বারান্দায় বসলাম। ভালো বর্ষণ শুরু হয়েছে। বারান্দা থেকে উত্তরা লেকের খানিকটা চোখে পড়ছে। হলুদ সোডিয়াম ল্যাম্পের কারণে

আপনাকে গল্প শোনাতে এসেছি।

আমি বললাম, নিজেই গল্প শুনাতে চলে এসেছেন, ব্যাপারটা বুঝলাম না। আপনার গল্প শোনার জন্যে তো অনেক ঝোলাকুলি করতে হয়।

মিসির আলি বললেন, আপনি হঠাৎ একা হয়ে পড়েছেন। সারাজীবন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আপনাকে ঘিরে ছিল। এখন কেউ নেই। আমি নিজে নিঃসঙ্গ মানুষ। নিঃসঙ্গতা আমার ভালোই লাগে। আপনার লাগার কথা না। গল্প বলে আপনাকে খানিকটা আনন্দ দেব। কোনো এক সময় গল্পটা। আপনি লিখেও ফেলতে পারেন।

আমি বললাম, Unsolved মিসির আলি?

হ্যাঁ। যে গল্পটা বলব। তার ব্যাখ্যা বের করতে পারি নি।

আমি বললাম, শুরু করুন। মিসির আলি বললেন, এখানে গল্প বলব না। ঘরের ভেতরে চলুন। আপনার দৃষ্টি বৃষ্টির দিকে। একজন কথক শ্রোতার কাছে পূর্ণ Attention দাবি করে। আমি গল্প বলব। আর আপনি বৃষ্টি দেখবেন তা হবে না।

গল্পের সঙ্গে আর কিছু লাগবে?

মিসির আলি বললেন, চা এবং সিগারেট লাগবে। ফ্লাস্কে চা আছে। সিগারেট আছে আমার পকেটে। ভালো কথা আমি আপনার জন্যে একটা বই নিয়ে এসেছি। স্যার্জ ব্রেসলি'র লেখা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

বিশেষ করে এই বইটি আনার কোনো কারণ আছে কি?

মিসির আলি বললেন, আছে। কিছু বই আছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়তে অসাধারণ লাগে। এটা সে রকম একটা বই।

আমরা দু'জন শোবার ঘরে ঢুকলাম। মিসির আলি বিছানায় পা তুলে আয়োজন করে গল্প শুরু করলেন। এত আয়োজন করে তাকে কখনো গল্প বলতে শুনি নি।

আমি যে খুব চা-প্রেমিক লোক তা না। তবে রাস্তার পাশে অস্থায়ী চায়ের দোকানে চা খেতে ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে তা বলতে পারছি না। এটা নিয়ে কখনো ভাবি নি।

শীতকালের দুপুর। বাসায় ফিরছি। পথে চায়ের দোকান দেখে রিকশা দাঁড় করিয়ে চা খেতে গেলাম। অনেকদিন এত ভালো চা খাই নি। চমৎকার গন্ধ। মিষ্টি পরিমাণ মতো। ঘন লিকার। চা শেষ করে দাম দিতে গেছি, দোকানি হাই তুলতে তুলতে বলল, দাম দিতে হবে না।

আমি বললাম, দাম দিতে হবে না কেন?

আপনে আজ ফ্রি।

ফ্রি মানে?

দোকানি বিরক্ত মুখে বলল, প্রত্যেক দিন পাঁচজন ফ্রি চা খায়। আইজ আপনে পাঁচজনের মধ্যে পড়ছেন। আর প্যাচাল পারতে পারব না। বিদায় হন।

ফ্রি চা খেয়ে বিদায় হয়ে যাবার প্রশ্নই আসে না। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম জনৈক 'প্রবেচার স্যার দোকানিকে প্রতি মাসে শুরুতে ৪৫০ টাকা দেন। যাতে প্রতিদিন পাঁচজন কাস্টমারকে সে ফ্রি চা খাওয়াতে পারে। তিন টাকা করে কাপ। দিনে পনেরো টাকা। ত্রিশ দিনে ৪৫০ টাকা।

আমি বললাম, প্রফেসর সাহেবের নাম কী?

নাম জানি না। কুদ্দুস জানে, কুদ্দুসারে জিগান।

কুদ্দুস কে?

রুটি বেচে। সামনের গলির ভিতর ঢুকেন। চার-পাঁচটা বাড়ির পরে কুদ্দুসের ছাপড়া পাইবেন।

কুদ্দুসও কি পাঁচজনকে ফ্রি রুটি খাওয়ায়?

জে। হে লাভ করে মেলা। ডেইলি সত্ত্বর টেকা পায়। এক দুইজনারে ফ্রি খাওয়ায়। বাকি টেকা মাইরা দেয়। প্রবেচার স্যাররে ঘটনা বলেছি। উনি কোনো ব্যবস্থা নেন নাই।

উনি থাকেন কোথায়?

জানি না। কুদ্দুস জানতে পারে। তারে জিগান গিয়া।

আমি কুদ্দুসের সন্ধানে বের হলাম। সে রাস্তার পাশে ছাপড়া ঘর তুলে রুটি, ডাল এবং সবজি বিক্রি করে। শুকনা মরিচের ভর্তা ফ্রি। দেখা গেল। সে প্রফেসার স্যারের নাম ছাড়া অন্য কিছুই জানে না। প্রফেসার স্যারের নাম জামাল। কুদ্দুসকে জামাল স্যারের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত মনে হলো। সে বলল, এমন ঝামেলার মধ্যে আছি। দুনিয়ার না খাওয়া মানুষ ভিড় কইরা থাকে ফ্রি খানার জন্য। পাঁচজনের বেশি খাওয়াইতে পারি না। এরা বুঝে না।

আমি বললাম, জামাল সাহেব কোথায় থাকেন জানো?

জানি না।

এই এলাকাতেই কি থাকেন?

বললাম তো জানি না।

উনার বয়স কত? চেহারা কেমন?

রোগা-পাতলা। মাথায় চুল কম। গায়ের রঙ ময়লা। চশমা আছে। বয়স কত বলতে পারব না। এখন যান। ত্যক্ত কইরেন না। ঝামেলায় আছি।

আমার জন্যে জামাল সাহেবকে খুঁজে বের করা কোনো সমস্যা না। বাসার ঠিকানা বের করে এক ছুটির দিনে সকাল এগারোটার দিকে উপস্থিত হলাম। একতলা বাড়ি। সামনে বাগান। বাগানে দেশি ফুলের গাছ। ক্যামিনি, হাসনাহেনা এইসব। বিশাল একটা কেয়া গাছের ঝোপ দেখলাম। বাড়ির সামনে কেউ সাপের ভয়ে কেয়া গাছ লাগায় না। উনি লাগিয়েছেন। বাঁশের একটা গেটের মতো আছে! গোটে বিখ্যাত নীলমণি লতা। বিখ্যাত কারণ নীলমণি লতা নাম রবীন্দ্রনাথের দেয়া। বড় গাছের মধ্যে একটা কদম গাছ এবং একটা বকুল গাছ। অচেনা একটা বিশাল গাছ দেখলাম।

কলিংবেল চাপ দিতেই দশ-এগারো বছরের এক কিশোরী দরজা খুলে দিল। আমি অবাক হয়ে কিশোরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। অবাক হবার কারণএমন মিষ্টি চেহারা! আমার প্রথমেই জিজ্ঞেস করা উচিত, এটা কি জামাল সাহেবের বাড়ি? তা না করে আমি বললাম, কেমন আছ মা?

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, চাচা, আমি ভালো আছি।

এই গাছটার নাম কী?

ছাতিম গাছ। অনেকে বলে ছাতিয়ান।

জামাল সাহেব তোমার কে হন?

বাবা।

উনি বাড়িতে আছেন?

বাজার করতে গেছেন। চাচা, ভেতরে এসে বসুন। বাবা চলে আসবেন।

মা, তোমার নাম কী?

আমার নাম ইথেন। বাবা কেমিস্ট্রির টিচার তো, এইজন্যে আমার নাম। রেখেছেন ইথেন। চাচা, ভেতরে আসুন তো।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। বসার ঘরে শীতলপাটি বিছানো। শীতলপাটির ওপর বেতের চেয়ার। দেয়ালে একটাই ছবি। জলরঙে আঁকা ঢাকা শহরে বৃষ্টি। এই একটা ছবিই ঘরটাকে বদলে ফেলেছে। ঘরটায় মিষ্টি স্বপ্ন তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে। আমি নিজেও এই ঘরের স্বপ্নের অংশ হয়ে গেছি।

ইথেন আমাকে লেবুর শরবত বানিয়ে খাওয়াল এবং মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করতে লাগল–

আমাদের কাজের মেয়েটার নাম শুনলে আপনি চমকে উঠবেন। নাম বলব চাচা?

বলো।

ওর নাম সুধারানী।

সুধারানী নাম শুনে চমকাব কেন?

কারণ নামটা হিন্দু, কিন্তু সে মুসলমান। সপ্তাহে সে একদিন ছুটি পায়। আজ তাঁর ছুটি। সে ঘরেই আছে, কিন্তু কোনো কাজ করবে না। এক কাপ চ পর্যন্ত নিজে বানিয়ে খাবে না। আমাকে বলবে, ইথু, এক কাপ চা দাও। আমাকে সে ডাকে ইথু।

ছুটির দিনে রান্না কে করে? তোমার বাবা?

হুঁ। আমি বাবাকে সাহায্য করি। বাবা লবণের আন্দাজ করতে পারে না। আমি লবণ চেখে দেই। আজ আমি একটা আইটেম রান্না করব।

কোন আইটেম?

আগে বলব না। আপনি খেয়ে তারপর বলবেন কোনটা আমি রোধেছি। আমি বললাম, মা, তুমি আমাকে চেনো না। আজ প্রথম দেখলে। আমি কী জন্যে এসেছি তাও জানো না। আমাকে দুপুরের খাবার দাওয়াত দিয়ে বসে আছ?

হ্যাঁ। কারণটা বলব?

বল।

আমার মা তখন খুবই অসুস্থ। বাবা মা'কে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে এসেছেন। যেন মা'র মৃত্যুর সময় আমি এবং বাবা মা'র দুই পাশে থাকতে পারি। কাঁদতে ইচ্ছা হলে আমি যেন চিৎকার করে কাঁদতে পারি। হাসপাতালে তো চিৎকার করে কাঁদতে পারব না। অন্য রোগীরা বিরক্ত হবে। তাই না চাচা?

হ্যাঁ।

এক রাতে মা'র অবস্থা খুব খারাপ হলো। আমি ঘুমাচ্ছিলাম, বাবা আমাকে ঘুম থেকে তুলে মা'র কাছে নিয়ে গেলেন। মা বললেন, আমার ময়না সোনা চাঁদের কণা ইথেন বাবু কেমন আছ?

আমি বললাম, ভালো আছি মা।

মা বলল, মাগো! আমি তো চলে যাব, মন খারাপ করো না।

আমি বললাম, আচ্ছা।

মা বলল, আমি থাকব না। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে থাকবে, বড় হবে। অনেকের সঙ্গে তোমার পরিচয়ও হবে। যেসব পুরুষমানুষ তোমাকে প্রথমেই মা ডেকে কথা শুরু করবে ধরে নিবে এরা ভালো মানুষ। কারণ তুমি খুব রূপবতী হবে। অতি অল্প পুরুষমানুষই অতি রূপবতীদের মা ডাকতে পারে। এই বিষয়টা আমি জানি, কারণ আমিও অতি রূপবতীদের দলের।

আমি বললাম, এই গল্পটা থাকুক মা। তুমি কাঁদতে শুরু করেছ। আমি কান্না সহ্য করতে পারি না।

ইথেন চোখ মুছতে মুছতে বলল, গল্পটা তো শেষ হয়ে গেছে। আর নাই। আপনি আমাকে মা ডেকে কথা শুরু করেছেন তো, এইজন্যে আমি জানি আপনি আমার আপনজন। চাচা ম্যাজিক দেখবেন?

তুমি ম্যাজিক জানো না-কি?

অনেক ম্যাজিক জানি। দড়ি কেটে জোড়া দেবার ম্যাজিক। কয়েন অদৃশ্য করার ম্যাজিক, অংকের ম্যাজিক।

কার কাছে শিখেছ?

বই পড়ে শিখেছি। আমার জন্মদিনে বাবা আমাকে একটা বই দিয়েছেন। বই-এর নাম- ছোটদের ম্যাজিক শিক্ষা। সেখান থেকে শিখেছি। আমি ঠিক করেছি। বড় হয়ে আমি জুয়েল আইচ আংকেলের কাছে ম্যাজিক শিখব। আচ্ছা! চাচা উনি কি আমাকে শেখাবেন?

শিখানোর তো কথা। আমি যতদূর জানি উনি খুব ভালো মানুষ।

ইথেন আয়োজন করে ম্যাজিক দেখাল। দড়ি কাঁটার ম্যাজিকে প্রথমবার কি যেন একটা ভুল করল। কাটা দড়ি জোড়া লাগল না। দ্বিতীয়বারে লাগল। আমি বললাম, এত সুন্দর ম্যাজিক আমি আমার জীবনে কম দেখেছি মা।

সত্যি বলছেন চাচা?

আমি বললাম, অবশ্যই সত্যি বলছি। ম্যাজিক দেখানোর সময় ম্যাজিশিয়ানের মুখ হাসি হাসি থাকলেও তাদের চোখে কুটিলতা থাকে। দর্শকদের তারা প্রতারিত করছে এই কারণে কুটিলতা। ম্যাজিকের বিস্ময়টাও তাদের কাছে থাকে না। কারণ কৌশলটা তারা জানে। তোমার চোখে কুটিলতা ছিল না। ছিল আনন্দ এবং বিস্ময় বোধ।

জামাল সাহেব বাজার নিয়ে ফিরলেন। আমাকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ঘরোয়া ভঙ্গিতে গল্প করতে দেখে মোটেই অবাক হলেন না। যেন আমি তার দীর্ঘদিনের পরিচিত কেউ। ভদ্রলোক স্বল্পভাষী এবং মৃদুভাষী। সারাক্ষণই তাঁর ঠোঁটের কোণায় হাসি লেগে থাকতে দেখলাম। যেন সারাক্ষণই তার চোখের সামনে আনন্দময় কিছু ঘটছে এবং তিনি আনন্দ পাচ্ছেন।

পাঁচজনকে রুটি খাওয়ানো এবং চা খাওয়ানো প্রসঙ্গে বললেন, খেয়াল আর কিছু না। খেয়ালের বশে মানুষ কত কী করে।

আমি বললাম, পাঁচ সংখ্যাটি কি বিশেষ কিছু?

তিনি বললেন, না রে ভাই। আমি পিথাগোরাস না যে সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাব। আমি সামান্য কেমিস্ট।

বিদায় নিতে গেলাম, তিনি খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, পাগল হয়েছেন! দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে তবে যাবেন। আমার মেয়ের আপনি অতিথি।

আমি বললাম, ঐ ছড়াটা জানেন? আমি আসছি আৎকা। আমারে বলে ভাত খা।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে ভেঙে পড়লেন, যেন এমন মজার ছড়া তিনি তার জীবনে শোনেন নি। তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন, ইথেন, তোর চাচু কী বলে শুনে যা! তোর চাচু বলছে- আমি আসছি আৎকা। আমারে বলে ভাত খা। হা হা হা।

আমি পুরোপুরি ঘরের মানুষ হয়ে দুপুরে তাদের সঙ্গে খাবার খেলাম। খাবারের আগে আমাকে টাওয়েল-লুঙ্গি দেয়া হলো। নতুন সাবানের মোড়ক খুলে দেয়া হলো। আমাকে গোসল করতে হলো। আমি দীর্ঘ জীবন পার করেছি। এই দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকবার নিতান্তই অপরিচিতজনদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছি। ঐ যে গানটা আছে না- আমাকে তুমি অশেষ করেছ, এ কি এ লীলা তব।

খাবার টেবিলে ইথেন বলতে লাগল, বাবা, তুমি চাচুকে মা'র গল্পটা বিলো। কীভাবে তোমাদের বিয়ে হয়েছে সেটা বলে।

জামাল সাহেব বললেন, আরেকদিন বলি মা?

ইথেন বলল, আজই বলতে হবে কারণ চাচু আর আসবে না।

কি করে জানো উনি আর আসবেন না।

ইথেন বলল, আমার মন বলছে। আমার মন যা বলে তাই হয়।

জামাল সাহেব গল্প শুরু করলেন। অস্বস্তি নিয়েই শুরু করলেন। জামাল

সাহেবের জবানিতে গল্পটা এই—

আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। বৃত্তি পরীক্ষা দেব। মন দিয়ে পড়ছি। বৃত্তি পেলে বাবা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবেন বলেছেন। নতুন সাইকেলের লোভে পড়াশোনা। বৃত্তি পাওয়ার লোভে না।

একদিন অংক করছি, হঠাৎ অংক বইয়ের ভেতর থেকে একটা মেয়ের পাসপোর্ট সাইজ ছবি বের হয়ে এলো। ছয়-সাত বছর বয়েসি মেয়ের ছবি। ছবির পেছনে লেখা জেসমিন। একজন সেই ছবি সত্যায়িত করেছেন। যিনি সত্যায়িত করেছেন তাঁর নাম এস রহমান। জেলা জজ। আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না এই ছবি কোত্থেকে এলো। আমার অংক বই কে ঘাটাঘাটি করবে? বাবাকে ছবিটা, দেখলাম। বাবা বললেন, কে এই মেয়ে? আশ্চর্য তো! আচ্ছা যা খুঁজে বের করছি। এটা কোনো ব্যাপারই না। জেলা জজ রহমান সাহেবের পাত্ত লাগালেই হবে। ছবিটা রেখে দে, চাইলে দিবি।

আমি আমার সুটকেসে ছবিটা রেখে দিলাম। বাবা কখনো ছবি চাইলেন না। বাবার স্বভাবই এ রকম, যে কোনো ঘটনা শুরুতে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ঘটনা সব গুরুত্ব হারাবে।

তার প্রায় আড়াই বছর পরের কথা। ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে গিয়েছি। ফর্ম, এটেস্টেড ছবি হেড ক্লার্ক সাহেবকে দিলাম। তিনি সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে বললেন–দুই কপি ছবি দিতে হবে। তিনি কপি কেন? এটা তো তোমার ছবিও না।

তিনি যে ছবি ফেরত দিলেন, সেটা ঐ জেসমিন মেয়েটার ছবি। তবে আগের ছবিটা না। অন্য ছবি। এতই সুন্দর ছবি যে একবার তাকালে চোখ ফেরানো অসম্ভব ব্যাপার।

আমি জেসমিনের তৃতীয় ছবিটা পেলাম তার দুই বছর পর। রিকশা থেকে নামার পর রিকশাওয়ালাকে মানিব্যাগ বের করে ভাড়া দিচ্ছি। রিকশাওয়ালা বলল, স্যার মানিব্যাগ থাইকা কী যেন নিচে পড়ছে।

তাকিয়ে দেখি একটা ছবি। জেসমিন নামের মেয়েটির ছবি। মেয়েটা এখন তরুণী। সৌন্দর্যে-লাবণ্যে ঝলমল করছে।

ছবিগুলি কোথেকে আমার কাছে আসছে তার কোনো হদিস বের করতে পারলাম না। একধরনের ভয় এবং দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে গেলাম। সবচেয়ে ভয় পেলেন আমার মা। তিনি পীর সাহেবের কাছ থেকে তাবিজ এনে গলায় এবং কোমরে প্রালেন।

জামাল সাহেব দিম নেবার জন্যে থামলেন।

আমি বললাম, ছবিগুলি যে একই মেয়ের সেই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?

জি। জেসমিনের ঠোঁটের নিচে বা দিকে একটা লাল তিল ছিল। একই রকম তিল আমার মেয়ে ইথেনের ঠোঁটের নিচেও আছে। জেনেটিক ব্যাপার। যাই হোক, সব মিলিয়ে আমি

পাঁচবার মেয়েটিয়া ছবি পাই। আমি যে পাঁচজনকে চা এবং রুটি খাওয়াই তার পেছনে হয়তো অবচেতনভাবে পাঁচ সংখ্যাটি কাজ করেছে।

তিনবার ছবি পাওয়ার ঘটনা শুনলাম। বাকি দু'বার কীভাবে পেলেন বলুন।

জামাল সাহেব বললেন, শেষবারেরটা শুধু বলি- শেষবার যখন ছবি পাই, তখন আমি আমেরিকায়। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এলাকালয়েডের ওপর পিএইচডি ডিগ্রির জন্যে কাজ করছি। জায়গাটা নর্থ ডাকোটায়, কানাডার কাছাকাছি। শীতের সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। টেম্পরেচার শূন্যের অনেক নিচ পর্যন্ত নামে। আমি গরম একটা ওভারকোট কিনেছি। তাতেও শীত আটকায় না। একদিন লাইব্রেরিতে গিয়েছি। লাইব্রেরিয়ানের হাতে ওভারকেটের পকেটে রাখা লাইব্রেরি কার্ড দিলাম। লাইব্রেরিয়ান কার্ড হাতে নিয়ে বলল, Your wife? very pretty, আমি অবাক হয়ে দেখলাম লাইব্রেরি কার্ডের পকেটে জেসমিনের ছবি। এই ছবি কোনো একটা পুরনো বাড়ির ছাদে তোলা। ছাদের রেলিং দেখা যাচ্ছে। রেলিং-এ কিছু কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। জেসমিন বসা আছে একটা বেতের মোড়ায়। তার হাতে একটা পিরিচ। মনে হয় পিরিচে আচার। কারণ জেসমিনের চারদিকে অনেকগুলি আচারের শিশি। রোদে শুকাতে দেয়া হয়েছে।

ছবির মেয়েটির সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে ভাবি নি। দেখা হয়ে গেল। দেশে ফিরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর হিসেবে জয়েন করেছি। একদিন নিউমার্কেটে গিয়েছি ষ্টেশনারি কিছু জিনিসপত্র কিনতে। হঠাৎ একটা বইয়ের দোকানের সামনে মেয়েটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে

পড়ে যাব। কীভাবে নিজেকে সামলালাম জানি না। আমি লাজুক প্রকৃতির মানুষ। সব লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে ছুটে গেলাম! মেয়েটির পাশে দাঁড়ালাম। সে চমকে তাকাল। আমি বললাম, আপনার নাম কি জেসমিন?

মেয়েটি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আপনি কি কোনো কারণে আমাকে চেনেন?

সে না-সূচক মাথা নাড়ল। আমি বললাম, আপনার কিছু ছবি আমার কাছে আছে।

আমার ছবি?

হ্যাঁ বিভিন্ন বয়সের আপনার পাঁচটা ছবি।

বলেই দেরি করলাম না। পকেট থেকে মানিব্যাপ বের করলাম। তখন আমি পাঁচটা ছবিই সবসময় সঙ্গে রাখতাম। আমি বললাম, এইগুলি কি আপনার ছবি?

জেসমিন হ্যা-সূচক মাথা নাড়ল। আমার কাছে মনে হলো, তাঁর ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির রেখা। আমি বললাম, এই ছবিগুলি আমার কাছে কীভাবে এসেছে আমি জানি না। আপনার কি কোনো ধারণা আছে?

জেসমিন জবাব দিল না।

আমি কি আপনার সঙ্গে কোথাও বসে এক কাপ চা খেতে পারি?

আমি চা খাই না।

তাহলে আসুন আইসক্রিম খাই। এখানে ইগলু আইসক্রিমের একটা দোকান আছে।

আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করছে না।

আমি বললাম, আপনাকে আইসক্রিম খেতে হবে না। আপনি আইসক্রিম সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাককেন। প্লিজ, প্লিজ প্লিজ।

জেসমিন বলল, চলুন।

সাতদিনের মাথায় জেসমিনকে বিয়ে করলাম। বাসররাতে সে বলল, ছবিগুলি কীভাবে তোমার কাছে গিয়েছে আমি জানি। কিন্তু তোমাকে বলব না। তুমি জানতে চেও না।

আমি জানতে চাই নি। এই গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি, আর কিছুর আমার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কম জানার ব্যাপারটায় সুখ আছে। Ignorence is bliss. আপনি কি জেসমিনের পাঁচটা ছবি দেখতে চান?

চাই।

ছবি দেখে আপনি চমকবেন।

আমি ছবি দেখলাম এবং চমকালাম। অবিকল ইথেন। দু'জনকে আলাদা করা অসম্ভব বলেই মনে হলো। জামাল সাহেব বললেন, আমি পড়াই বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞান রহস্য পছন্দ করে না। কিন্তু আমার জীবন কাটছে রহস্যের মধ্যে। অদ্ভুত না?

অদ্ভুত তো বটেই। আচ্ছা ছাদে জেসমিনের যে ছবিটা তোলা হয়েছে। চারদিকে আচারের বোতল। সেই বাড়িটা কি দেখেছেন।

জামাল সাহেব বললেন, সে রকম কোনো বাড়িতে জেসমিনরা কখনো ছিল না। ছবি বিষয়ে এইটুকুই শুধু জেসমিন বলেছে।

আমি বিদায় নিয়ে ফিরছি। জামাল সাহেব আমাকে গেোট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। শেষ মুহূর্তে বললেন, আমার মেয়ে ইথেন কিছুদিন আগে হঠাৎ করে বলল, তার মা'র ছবি কীভাবে আমার কাছে এসেছে তা সে জানে। তবে আমাকে কখনো বলবে না। আমি বলেছি, ঠিক আছে মা, বলতে হবে না।

ফ্লুট ফ্লাই

মিসির আলি সাহেবের পেটমোটা ফাইল আছে। ফাইলের ওপর ইংরেজিতে লেখা— Unsolved. যেসব রহস্যের তিনি মীমাংসা করতে পারেন নি তার প্রতিটির বিবরণ। আমি কয়েকবার তার ফাইল উল্টেপাল্টে দেখেছি। কোনো কিছুই পরিষ্কার করে লেখা নেই। নোটের মতো করে লেখা। উদাহরণ দেই- একটি অমীমাংসিত রহস্যের (নম্বর ১৮) শিরোনাম 'BRD', 'BRD' কী জিজ্ঞেস করে জানলাম BRD হলো বেলারানী দাস। মিসির আলি লিখেছেন

BRD
বয়স ১৩
বুদ্ধি ৭
বটগাছ ১০০
বজ্রপাত ২
BRD বটগাছ Union
কপার অক্সাইড

আমি বললাম, যা লিখেছেন এর অর্থ কী? বয়স ১৩ বুঝতে পারছি। বেলারানী দাসের বয়স তের। বুদ্ধি ৭-এর অর্থ কী?

মিসির আলি বললেন, বুদ্ধি মাপার কিছু পরীক্ষা আছে। IQ টেস্ট। এই টেস্ট আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না। আইনষ্টাইনের মতো মানুষ IQ টেষ্টে হাস্যকর নাম্বার পেয়েছিলেন। আমি

নিজে এক ধরনের পরীক্ষা করে বুদ্ধির নাম্বার দেই। সেই নাম্বারে সর্বনিম্ন হলো এক সর্বোচ্চ দশ। আমার হিসেবে বেলারানীর বুদ্ধি ছিল সাত।

আমি বললাম, আপনার হিসেবে আমার বুদ্ধি কত?

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, ছায়ের কাছাকাছি। তবে এতে আপসেট হবেন না। মানুষের গড় বুদ্ধি পাঁচ। তা ছাড়া আপনি লেখক মানুষ। ক্রিয়েটিভ মানুষদের সাধারণ বুদ্ধি কম থাকে।

আমি বললাম, আমার বুদ্ধি কম এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বটগাছ ১০০এর অর্থ কী?

একটা বটগাছের কথা বলেছি। যার আনুমানিক বয়স ধরেছি ১০০ বছর।

বজ্রপাত ২ মানে?

বটগাছে দু'বার বজ্রপাত হয়েছিল। শেষ বজ্রপাতে বটগাছটা মারা যায়।

BRD বটগাছ Union-টা ব্যাখ্যা করুন।

বেলারানীর বাবা-মা তাদের মেয়েটাকে একটা বটগাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দুদের কিছুবিচিত্র আচার আছে! গাছের সঙ্গে বিয়ে তার একটা। এখন যদিও এই প্রথা নেই। তারপরেও বেলারানীর বাবা-মা কাজটা করেছিলেন।

কপার অক্সাইড কী?

কপার ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের যৌগ- CuO.

গল্পটা বলুন।

না।

না কেন?

কিছু কিছু গল্প আছে বলতে ইচ্ছা করে না। এটা সেরকম একটা গল্প। সব গল্প জানানোর জন্যে না।

আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। এই গল্প আমি কোথাও লিখব না। কাউকে বলবও না।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, না।

তার না বলার বিশেষ একটা ভঙ্গি আছে। এই ভঙ্গিতে যখন না বলে ফেলেন। তখন তাকে আর হ্যা বানানো যায় না। আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

মিসির আলি বললেন, অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে গল্প করা ঠিক না। এতে মানুষ Confused হয়ে যায়। ঘটনার উপর নানান আধ্যাত্মিকতা আরোপ করে। চলে আসে ভূত-প্রেত। সাধু-সন্ন্যাসী।

আমি বললাম, ভূত-প্রেত বাদ দিলাম, সাধু-সন্ন্যাসীরা তো আছেন। না-কি তাদের অস্তিত্বেও আপনার অবিশ্বাস?

মিসির আলি বললেন, অবিশ্বাস। ধর্ম হলো পরিপূর্ণ বিশ্বাস। আর বিজ্ঞান হলো পরিপূর্ণ অবিশ্বাস। ধর্মের বিশ্বাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই থাকে। বিজ্ঞানের অবিশ্বাস কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বদলায়। কিছু কিছু অবিশ্বাস বিশ্বাসে রূপ নেয়।

আপনি তো একজন সাইকোলজিষ্ট, বিজ্ঞানী না।

মিসির আলি বললেন, মানুষ মাত্রই বিজ্ঞানী। অবিশ্বাস করা তার Natureএর অংশ। সে জঙ্গলে হাঁটছে। একটা সাপ দেখল। সে শুরু করল অবিশ্বাস দিয়ে—দড়ি না তো? না-কি সাপ?

আবার সে পথে হাঁটতে হাঁটতে একটা দড়ি দেখল। সে শুরু করল অবিশ্বাস দিয়ে—সাপ না তো? না-কি দড়ি। চা খাবেন?

খাব ।

ঘরে শুধু চা-পাতা আছে। আর কিছুই নেই। লিকার চা চলবে?

চলবে।

মিসির আলি রান্নাঘরে ঢুকলেন এবং বের হয়ে এসে জানালেন, চা পাতাও নেই। চলুন কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে চা খেয়ে আসি।

আমি বললাম, রেস্টুরেন্টে যেতে ইচ্ছা করছে না। আপনার সঙ্গে নিরিবিলি গল্প করছি এই ভালো।

সময় রাত আটটা। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মিসির আলির ঘরের চাল টিনের। চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভালো লাগছে। ঢাকা শহরে সেই অর্থে কখনো বৃষ্টির শব্দ কানে আসে না। শহরের কোলাহল বৃষ্টির শব্দ গিলে ফেলে।

মিসির আলি বললেন, হাবলু মিয়ার গল্প শুনবেন?

আমি বললাম, গল্পটা যদি আপনার Unsolved খাতায় থাকে তাহলে শুনব। আপনার মতো মানুষ রহস্যের কাছে ধরা খেয়ে গেছেন ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।

মিসির আলি বললেন, হাবলু মিয়ার গল্প আমার Unsolved ফাইলে আছে। ৩৮ নম্বর।

সব গল্পের নাম্বার আপনার মনে থাকে?

তা থাকে। ফাইলটা নিয়ে আমি প্রায়ই বসি। রহস্যের কিনারা করা যায় কি না তা নিয়ে ভাবি। এখনো হাল ছাড়ি নি। হাল ধরে বসে আছি। অকূল সমুদ্র। নৌকা কোন দিকে নিয়ে যাব বুঝতে পারছি না।

হাবলু মিয়ার গল্পটা শুরু করুন।

মিসির আলি গল্প শুরু করলেন। সাধারণত দেখা যায় শিক্ষকরা ভালো গল্প বলতে পারেন না। তাদের গল্প ক্লাসের বক্তৃতার মতো শোনায়। যিনি গল্প শোনেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাই ওঠে। এক পর্যায়ে শ্রোতা বলেন, ভাই, বাকিটা আরেকদিন শুনব। আজ একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে। এখন না গেলেই না।

মিসির আলি শিক্ষক গল্পকথকের দলে পড়েন না। তাঁর বর্ণনা সুন্দর। গল্পের কোন জায়গায় কিছুক্ষণ থামতে হবে তা জানেন। পরিবেশ এবং চরিত্র বর্ণনা নিখুঁত। আমার প্রায়ই মনে হয় মিসির আলির মুখের গল্প CD আকারে বাজারে ছেড়ে দিলে ভালো বাজার পাওয়া যাবে। যাই হোক, তার জবানীতে গল্পটা বলার চেষ্টা করি।

হাবলু মিয়ার বয়স কত বলতে পারছি না। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসিমুখে বলল, জানি না। স্যার। বাপ-মা কিছু বইলা যায় নাই। মুরুকু পিতামাতা। এইসব জানেও না। আপনে একটা অনুমান কইরা নেন।

আমি অনুমান করতে পারলাম না। কিছু মানুষ আছে যাদের বয়স বোঝা যায়। না। হাবলু মিয়া সেই দলের। তার বয়স পঁচিশ হতে পারে, আবার চল্লিশও হতে পারে। অতি রুগ্ন মানুষ। খিকখিক কাশি লেগেই আছে। গায়ের রঙ এক সময় ফর্সা ছিল। রোদে ঘুরে রঙ জ্বলে গেছে। মাথা সম্পূর্ণ কামানো। গায়ে কড়া নীল রঙের পাঞ্জাবি। পরনের লুঙ্গির রঙ এক সময় খুব সম্ভবত সাদা ছিল! ময়লার আস্তর পড়ে এখন ছাইবর্ণ। পায়ে চামড়ার জুতা। জুতাজোড়া নতুন। চকচক করছে। লোকটার গা থেকে বিকট গন্ধ আসছে। আমি বললাম, গাঁজা খাবার অভ্যাস আছে?

হাবলু মিয়া আবার দাঁত বের করে হাসিমুখে বলল, জি স্যার।

আজ খেয়েছেন?

জে না। দিনে খাই না। সবকিছুর নিয়ম আছে। গাঁজা খাইতে হয়। সূর্য ডোবার পরে। চরস খাইতে হয় দুপুরে।

লেখাপড়া কিছু করেছেন?

ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি। ক্লাস ফাইভ পাস করার ইচ্ছা ছিল। একদিন হেড স্যার বললেন, তোর আর লেখাপড়া লাগবে না। তুই চলে যা।

চলে যেতে বললেন কেন?

সেটা উনারে জিগাই নাই। শিক্ষক মানুষরে তো আর জিজ্ঞাস করা যায় না। উনাদের কথা মান্য করতে হয়। উনাদের আলাদা মর্যাদা।

আপনার পায়ের জুতাজোড়া তো নতুন মনে হচ্ছে।

হাবলু মিয়া আনন্দিত গলায় বলল, চুরির জুতা স্যার। আমি নিজেই চুরি করেছি। কীভাবে চুরি করেছি। শুনলে মজা পাবেন। স্যার বলব?

বলুন।

আমারে স্যার তুমি কইরা বলবেন। আমি অতি নাদান লোক। আপনের নাকের সর্দির যোগ্যও না। তার চেয়েও অধম। জুতাচুরির গল্পটা কি শুরু করব?

শুরু করে।

জুম্মার নামাজ শুরু হইছে। আমি সোবাহান মসজিদের কাছে। রাস্তা বন্ধ কইরা নামাজ। শেষ সারিতে দেখি এক লোক তার সামনে নয়া জুতা রাইখা নামাজ পড়তাছে। আমি তার সামনে থাইকা জুতাজোড়া নিলাম। সে নামাজের মধ্যে ছিল বইলা আমারে কিছু বলতে পারল না। একবার তাকাইলো। আমি ঝাইড়া দৌড় দিলাম। আমার ভাগ্য ভালো জুতাজোড়া ভালো ফিটিং হইছে। চুরির জুতা ফিটিং-এ সমস্যা।

জুতা কি প্রায়ই চুরি করে?

জে। একেকলার একেক মসজিদে যাই। বনানী মসজিদ থেকে একজোড়া স্যান্ডেল চুরি করেছিলাম। বিলাতি জিনিস, দুইশ' টাকায় বিক্রি করেছি। এখন আফসোস হয়।

আফসোস হয় কেন?

নিজের ব্যবহারের জন্যে রেখে দিতে পারতাম। স্যান্ডেলে আরাম বেশি। একটু পানের ব্যবস্থা কি করা যায় স্যার? জর্দা লাগবে না। জর্দা আমার সঙ্গে আছে। গোপাল জর্দা। গোপাল জর্দা ছাড়া অন্য জর্দা আমার মুখে রুচে না।

দিনে কয়টা করে পান খাও?

তার কি স্যার হিসাব আছে। ভাতের হিসাব থাকে। দৈনিক দুই বার কি তিন বার। পান এবং চা। এই দুইয়ের হিসাব নাই।

পানের ব্যবস্থা করছি, এখন বলো তুমি যে জুতা চুরি করো খারাপ লাগে না।

খারাপ লাগে না। স্যার, মজা পাই। ইন্টারেষ্ট পাই। বাইচ থাকতে হইলে ইন্টারেস্ট লাগে। ঠিক বলেছি। স্যার?

হুঁ।

পানের ব্যবস্থা তো স্যার এখনো করেন নাই? অস্থির লাগতেছে।

সে পান ছাড়াই বেশ খানিকটা জর্দা মুখে দিয়ে চিবুতে লাগল।

হাবলু মিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগের বিষয়টা এখন পরিষ্কার করি। তাকে পাঠিয়েছে আমার এক ছাত্র। হাবলু মিয়ার না-কি অদ্ভুত এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। যে কোনো ফলের নাম বললেই সে দুই হাত মুঠি বন্ধ করে। মুঠি খুললেই সেই ফল হাতে দেখা যায়। যে মুঠিবদ্ধ করে ফল আনতে পারে সে পানিও আনতে পারে। পানটা সে কেন আনছে না, বুঝলাম না।

আমি আমার ছাত্রের কথায় কোনোই গুরুত্ব দেই নি। সহজ হাতসাফাই বোঝাই যাচ্ছে। যেসব ফলের নাম চট করে মানুষের মাথায় মনে আসে। সেই সব বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়। যথাসময়ে বের করা হয়।

ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে বলি। একজন বুজরুক আমাকে বলল, স্যার যে কোনো একটা ফুলের নাম বলুন। যে ফুলের নামই বলবেন সেই ফুল আমি পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে দেব।

আমি বললাম, দুপুরমণি ফুল। তুমি বের করো।

সে বলল, স্যার পারলাম না। দুপুরমণি ফুলের নামই শুনি নাই। আজ প্রথম শুনলাম।

আমি বললাম, তোমার পাঞ্জাবির পকেটে আছে গোলাপ ফুল। তুমি এই খেলাটা গোলাপ ফুল নিয়েই দেখাও। কারণ দশজন মানুষের মধ্যে সাতজনই বলবে গোলাপ ফুলের কথা।

বুজরুকি মাথা চুলকে বলল, স্যার কথা সত্য বলেছেন। মাটি খাই। তয় স্যার শুধু গোলাপ রাখি না। রজনীগন্ধাও রাখি। আজকাল অনেকেই রজনীগন্ধার কথা বলে।

যাই হোক, আমাদের হাবলু মিয়াকে আমি সেই দলেই ফেলেছি। লোকটার চোখই বলে দিচ্ছে সে মহা্ধূর্ত। অনেককে ধোঁকা দিয়ে এখন সে এসেছে আমার

ঘরে পান ছিল না। দোকান থেকে পান আনিয়ে তাকে দিয়েছি। দুই খিলি পান একসঙ্গে মুখে পুরে সে জড়ানো পলায় বলল, স্যার কি খেতে চান বলেন, এনে দেই। সে হাত মুঠি করল।

আমি বললাম, একটা আখরোট এনে দাও।

হাবলু মিয়া বিক্ষিত গলায় বলল, আখরোট কী জিনিস?

এক ধরনের বাদাম।

জীবনে স্যার নাম শুনি নাই।

আমি বললাম, আমাকে তাহলে খাওয়াতে পারস্থ না?

হাবলু মিয়া বলল, কেন পারব না। স্যার! আপনি খাবেন। আমিও একটু খায়া দেখব। তবে স্বাদ পাব বলে মনে হয় না। পান-জর্দা খায়া জিবরা নষ্ট। যাই খাই ঘাসের মতো লাগে। একবার নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি খাওয়ার শখ হলো। খায়া দেখি সেইটাও ঘাসের মতো। মিষ্টির বংশ নাই। আমার কাছে এখন চিনিও যা, লবণও তা।

কথা শেষ করে হাবলু মিয়া হাতের মুঠি খুলল। তার হাতে দুটা আখরোট। সে বিস্মিত হয়ে আখরোট দেখছে। আমি মোটামুটি হতভম্ব। হাবলু মিয়া বলল, জিনিসটা ভাঙে ক্যামনে? দাঁত দিয়া?

হাবলু মিয়া কামড়াকামড়ি শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আখরোটের শক্ত খোসা ভাঙিল। হাবলু মিয়া বাদাম ভেঙে মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, কোনো স্বাদ নাই। শুকনা খড়ের মতো।

আমি বললাম, এখন কি অন্য কোনো ফল আনা যাবে?

হাবলু বলল, অবশ্যই। ফলের নাম বলেন। তবে স্যার হাতের মুঠার চেয়ে বড় ফল হইলে পারব না। তরমুজ আনতে পারব না। কলা পারব না।

আমি বললাম, আমি আনতে পারবে? ছোট সাইজের আমি তো আছে।

আম পারব। আমি অনেকবার অনছি।

হাবলুমিয়া দুই হাত (ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে) মুঠির মতো করল। চোখ বন্ধ করল। সামান্য ঝাকি দিয়ে মুঠি খুলল— আমি সেখানে আছে। সে আমার হাতে আম দিতে দিতে বলল, খেয়ে দেখেন স্যার মিষ্টি আছে কি-না। মধুর মতো মিষ্টি হওয়ার কথা। মাঝে মাঝে টকও হয়। একবার একটা আমি আসছে- ‘কাক দেশান্তরী আমি। এমন টক যে কাক খাইলে দেশান্তরী হবে। স্যার, আমার খেলা দেখে খুশি হয়েছেন?

খুশি হয়েছি। এটা কি কোনো খেলা?

স্যার দুনিয়াটাই তো খেলা। বিরাট খেলা । ক্রিকেট খেলা। কেউ সেঞ্চুরি করতেছে, কেউ আমার মতো শূন্য পায়া আউট। আবার কেউ কেউ আছে বেটিং করার সুযোগ পায় না। না খেইলাই আউট।

ফালগুলি আসে কীভাবে?

স্যার বললাম না খেলা! খেলার মাধ্যমে আসে।

খেলছে। কে?

সেটা তো স্যার বলতে পারব না। জ্ঞান-বুদ্ধি নাই। ক্লাস ফাইভ পাস করার শখ ছিল। পারলাম না। স্যার, ঘরে কি ছুরি আছে?

ছুরি দিয়ে কি করবেঃ

আমট কাঁইট্যা একটা ছোট্ট পিস খায়া দেখতাম। মিষ্টি কি-না। যদিও মন বলতেছে মিষ্টি। তয় মনের কথা বনে ষায়।

আমি ছুরি আনলাম। এক পিস হাবলু মিয়া খেল। এক পিস। আমি খেলাম।

আম মিষ্টি। কড়া মিষ্টি।

হাবলু আনন্দিত গলায় বলল, ইজ্জত রক্ষা হইছে। আমি মিষ্টি। টক হইলে আপনের কাছে বেইজ্জত হইতাম। স্যার, ইজাজত দেন, উঠি?

আরেকবার আসতে পারবেন?

কেন পারব না। যেদিন বলবেন সেদিন আসব। শুক্রবারটা বাদ দিয়া। ঐ দিন জুতা চুরি করি। স্যার কিছু খরচ দিবেন। খেলা দেখাইলাম। এই জন্যে খরচ।

তোমার এই খেলা দেখিয়ে তুমি টাকা নাও?

জে নেই। আমার কোনো দাবি নাই। যে যা দেয় নেই।

সবচেয়ে বেশি কত পেয়েছে?

পাঁচশ’ একবার পাইছিলাম। স্যারের নাম ভুইল্যা গেছি। মুসুল্ল মানুষ। নুরানী চেহারা। সেই মুরুবি ভাবছে আমি জ্বিনের মাধ্যমে আনি। আমি স্বীকার পাইছি। তার ভাবনা সে ভাববে। আমার কী?

মুরুব্বি বলল, হাবলু মিয়া তোমার কি জ্বিন আছে?

আমি বললাম, জ্বে স্যার আপনের দোয়ায় আছে।

মুরুব্বি বলল, জ্বিন কয়টা।

আমি বললাম, দুইটা। একটা মাদি আরেকটা মর্দা। মর্দটার নাম জাহেল। ফল-ফুরুট সেই আনে।

মুরুবি আমার কথা সবই বিশ্বাস পাইছে। আমারে বখশিশ দিছে পাঁচশ’ টেকা।

আমি বললাম, তুমি জ্বিনের মাধ্যমে আনো না?

জে না।

কীভাবে আনো?

স্যার আপনারে তো আগে বলেছি। এইটা একটা খেলা।

খেলাটা তোমাকে কে শিখিয়েছে?

নিজে নিজেই শিখছি। কীভাবে শিখলাম সেটা শুনেন। ফার্মগেটের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি এক লোক পিয়ারা বিক্রি করতেছে। হাতে টাকা নাই। টাকা থাকলে কিনতাম। হঠাৎ কী মনে করে হাত মুঠা করলাম। মুঠা খুলে দেখি পিয়ারা। স্যার কিছু খরচ কি দিবেন? যা দিবেন। তাতেই খুশি। পঞ্চাশ একশ' দুইশ'...।

আমি তাকে এক হাজার টাকা দিলাম। পাঁচশ' টাকার দু'টা নোট পেয়ে সে হতভম্ব। তাকে বললাম। পরের বুধবারে আসতে। সে বলল, সকাল দশটা বাজার আগেই বান্দা হাজির থাকবে। যদি না থাকি তাইলে মাটি খাই। কব্বরের মাটি খাই।

আমি বললাম, ফল ছাড়া অন্য কিছু আনতে পারো না?

হাবলু বলল, জে না।

চেষ্টা করে দেখেছ?

অনেক চেষ্টা নিয়েছি। লাভ হয় নাই। একবার জর্দার শট হইল। হাতে নাই পয়সা। জর্দা। কিনতে পারি না। জর্দা বিনা পানীও খাইতে পারতেছি না। শরীর কষা হয়ে গেছে। তখন অনেকবার হাত মুঠ করলাম। মনে মনে বললাম, আয় জর্দা আয়। মুঠা খুঁইল্যা দেখি কিছু না। সব ফক্কা।

মিসির আলি থামলেন। আমি বললাম, ঐ লোক উপস্থিত থাকলে ভালো হতো। হাত মুঠি করত। বাগানের ফ্রেশ চা চলে আসত। চা খাওয়া যেত। এমন জমাটি গল্প চা ছাড়া চলে না। ঘরে ফ্লাস্ক আছে? ফ্লাস্ক দিন আমি দোকান থেকে চা নিয়ে আসছি।

মিসির আলি বললেন, চা আনতে হবে না। চা চলে আসবে।

আমি বললাম, শূন্য থেকে আবির্ভূত হবে? হাবলু মিয়ার মতো?

মিসির আলি বললেন, না। চা-সিঙ্গাড়া বাড়িওয়ালা পাঠাবেন। একটা বিশেষ দোকানের সিঙ্গাড়া তার খুবই পছন্দ। প্রায়ই গাদাখানিক কিনে আনেন। আমাকে পাঠান। তাঁকে সিঙ্গারার ঠোঙ্গা নিয়ে এইমাত্র বাসায় ঢুকতে দেখলাম।

মিসির আলির কথা শেষ হবার আগেই একটা কাজের ছেলে ফ্লাস্ক ভর্তি চা এবং ছয়টা সিঙ্গাড়া নিয়ে ঢুকল। সিঙ্গাড়া সাইজে ছোট। অসাধারণ স্বাদ। যে দোকানে এই জিনিস তৈরি হয় তার কোটিপতি হয়ে যাবার কথা।

আমি চা খেতে খেতে বললাম, তারপর? বুধবার ঐ লোক এলো?

না।

কবে এসেছিল?

আর আসেই নি।

বলেন কি?

আমার ধারণা মারা গেছে। পত্রিকায় একটা নিউজ পড়েছিলাম- মুসল্লিদের হাতে জুতাচোরের মৃত্যু। সেই জুতা চোর আমাদের হাবলু মিয়া তাতে সন্দেহ নেই।

আমি বললাম, আপনি তো গল্পের শেষটা জানতে পারলেন না।

না।

গল্প কি এখানেই শেষ?

এখানেই শেষ না। কিছুটা বাকি আছে।

আর বাকি কী থাকবে? গল্পের যে কথক সে-ই মৃত। গল্প কি থাকবে?

মিসির আলি বললেন, আমাটা তো আছে। পাখি চলে গেছে। কিন্তু পাখির পালক তো ফেলে গেছে। আমাটা হলো পাখির পালক।

আমি বললাম, পাখির পালক, অর্থাৎ আমাটা দিয়ে কি করলেন?

মিসির আলি বললেন, একজন ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আম তৈরিতে হয়তো ম্যাজিকের কিছু গোপন কৌশল আছে যা আমার জানা নেই। আটলান্টিক সিটিতে একবার একটা ম্যাজিক শো দেখেছিলাম। সেখানে ম্যাজিশিয়ান ফুলের টবে একটা আমের আঁটি পুতলেন। রুমাল দিয়ে ঢাকলেন। রুমাল সরালেন, দেখা গেল আম গাছের চারা বের

হয়েছে। আবার সেই চারা রুমাল দিয়ে ঢাকলেন। রুমাল সরালেন, দেখা গেল। গাছ ভর্তি আমি। এই ধরনের কোনো কৌশল কি হাবলু মিয়া করেছে?

আমার ম্যাজিশিয়ান বন্ধু আমের পুরো ঘটনা শুনে বললেন, হিপিনোটিক সাজেশান হতে পারে। হিপনোটিক সাজেশান মাঝে মাঝে এত গভীর হয় যে সামান্য মাটির দলকে আম বা অন্য যে কোনো ফল মনে হবে। হিপনোটিষ্ট যদি বলেন আমাটা মিষ্টি তাহলে মাটির দলা মুখে দিলে মিষ্টি লাগবে। হিপনোটিষ্ট যদি বলেন, আমাটা টক তাহলে মাটির দলার স্বাদ হবে। টক। তবে এই অবস্থা বেশি সময় থাকবে না। Trance অবস্থা কেটে গেলে মাটির দলাকে মাটির দলাই মনে

হবে।

আমাকে দেয়া আমাটা মাটির দিলা বা অন্যকিছু হয়ে গেল না। আমিই রইল। তৃতীয় দিনে আমি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার করলাম।

সেটা কী?

মিসির আলি বললেন, Fruit Fry বিষয়ে আপনার কোনো জ্ঞান আছে?

আমি বললাম, পাকা ফলের উপর ছোট ছোট যেসব পোকা উড়ে তার কথা বলছেন?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ। এরা এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ লম্বা। চোখ লাল। শরীরের প্রথম অংশ লালচে, শেষ অংশ কালো। পাকা ফল যা Farmented হচ্ছে তার উপর এরা ডিম পাড়ে। এক একটি স্ত্রী ফ্রুট ফ্লাই পাঁচশ'র মতো ডিম পাড়ে। ডিম থেকে

বাচ্চ হতে সময় নেয় এক সপ্তাহ। আমার গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা হচ্ছে তিনদিন পার হবার পরেও আমের উপর কোনো ফ্রুট ফ্লাই উড়ছে না। অর্থাৎ আমে পচন ধরছে না।

যে সময়ের কথা বলছি তখন আমের সিজন না। তবে ফা‌েল চাষে হয়তো কোনো বড় ধরনের বিপ্লব হয়েছে। সব ঋতুতেই সব ধরনের ফল পাওয়া যায়। আমি বাজার থেকে একটা পাকা আমি কিনে আনলাম। জাদুর আমি থেকে এক ফুট দূরে সেটা রাখলাম। এক ঘণ্টা পার হবার আগেই কেনা আমাকে ঘিরে ফ্রুট ফ্লাই ওড়াউড়ি শুরু করল। এদের কেউ ভুলেও জাদুর আমের কাছে গেল না।

মিসির আলি বড় করে নিশ্বাস ফেললেন। আমি বললাম, গল্প কি শেষ?

মিসির আলি বললেন, একটু বাকি আছে। আজই শুনবেন না-কি অন্য একদিন আসবেন? বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন চলে যাওয়াই ভালো। রাত অনেক হয়েছে।

আমি বললাম, শেষটা শুনে যাব। তার আগে না।

মিসির আলি বললেন, আন্টার্কটিকা মহাদেশে একবার উল্কাপাত হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে NASA-র জনসন স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের বিজ্ঞানীরা সেই উল্কা পরীক্ষা করেন। উল্কার নম্বর হচ্ছে ALIT84001.

আমি বললাম, নাম্বার মনে রাখলেন কীভাবে?

মিসির আলি বললেন, জাদুর আম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এইসব জানতে হয়েছে। আমার Unsolved খাতায় নাম্বার লেখা আছে।

আমি বললাম, উল্কার সঙ্গে আপনার জাদুর আমের সম্পর্ক কী?

মিসির আলি বললেন, ঘটনাটা বলে শেষ করি। তারপর আপনি বিবেচনা করবেন সম্পর্ক আছে কি-না!

বলুন।

বিজ্ঞানীরা সেই উল্কার কিছু Organic অণু পেলেন। জটিল কোনো অণু না। Polycyclic aormatic hydrocarbon. বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন এই অণুগুলি পৃথিবী নামক গ্রহের না, গ্রহের বাইরের। কারণ এরা ছিল Levorotatory, পৃথিবী নামক গ্রহের সব Organic অনু হয় Dextrorotator. অর্থাৎ এরা Plain polarized light ডান দিকে ঘুরায়। বিজ্ঞানীরা অতি সহজ একটা পরীক্ষা থেকে বলতে পারেন কোনো বস্তু এই পৃথিবীর না-কি পৃথিবীর বাইরের।

আমি বললাম, আপনি আমটি পৃথিবীর না পৃথিবীর বাইরের এই পরীক্ষা করলেন?

মিসির আলি বললেন, এই ধরনের পরীক্ষা করার মতো যোগ্যতা বা যন্ত্রপাতি কোনোটাই আমার নেই। তবে আমি আমের শাস সিল করা কৌটায় ইতালির এন্থন ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিলাম। তারা জানালেন এই ফলটির রস Levorotatory, অর্থাৎ এর Origin পৃথিবী নামক গ্রহ না!

বলেন কী?

মিসির আলি বললেন, একটা ছোট্ট পরীক্ষা অবশ্যি আমি নিজেই করলাম। একটা টবে যত্ন করে আমের আঁটিটা পুতলাম। সেখান থেকে গাছ হয় কি-না তাই দেখার ইচ্ছা।

হয়েছিল?

মিসির আলি বললেন, সেটা বলব না। কিছু রহস্য থাকুক। রহস্য থাকলেই গল্পটা আপনার মনে থাকবে। মানুষ রহস্যপ্রিয় জাতি। সে শুধু রহস্যটাই মনে রাখে, আর কিছু মনে রাখতে চায় না।

মাছ

পৃথিবীর সবচে’ ছোট সাইজের মাছের নাম জানেন?

মলা মাছ?

মলা মাছ তো অনেক বড় মাছ। পৃথিবীর সবচে ছোট সাইজের মাছ এক ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ।

বলেন কি?

মিসির আলি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, এই মাছের নাম Paedocypris fish. বিজ্ঞানীরা এই মাছের সন্ধান পান সুমাত্রার জঙ্গলের জলাভূমিতে। মাছটা কাচের মতো স্বচ্ছ।

আমি বললাম, হঠাৎ মাছ প্রসঙ্গ কেন?

মাছ বিষয়ে এক সময় খুব পড়াশোনা করেছি। অদ্ভুত মাছ কি আছে জানার চেষ্টা করেছি। সমুদ্রে এক ধরনের মাছ আছে যাদের গায়ে চৌম্বক শক্তি।

আমি বললাম চুম্বক, শক্তির মাছের কথা জানি না, তবে গায়ে ইলেকট্রিসিটি আছে এমন মাছের কথা পড়েছি- ইল মাছ।

নাম সামছু। উনার গল্প শুনবেন?

গল্প শোনার জন্যেই তো এসেছি।

মিসির আলি কোলে বালিশ টেনে নিয়ে আয়োজন করে গল্প শুরু করলেন।

লেখকরা বিচিত্র চরিত্রের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন। চরিত্র নির্মাণে তাদের সাহায্য হয়। আমি লেখক না তারপরেও বিচিত্র সব চরিত্রের মুখোমুখি হতে ভালো লাগে। তারা যখন কথা বলে তখন তাদের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করি। কথা বলতে গিয়ে বেশিরভাগ মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেন। সন্দেহ বাতিক গ্রস্ত মানুষ কথা বলবেন চিবিয়ে। দুর্বল চিত্তের মানুষ কথা বলবেন নিচু গলায়। ক্রিমিন্যালরা কথা বলার সময় চোখের দিকে খুব কম তাকাবে।

যাই হোক অতি বিচিত্র এক চরিত্রের কথা বলি। নাম আগেই বলেছি সামছু, মোহাম্মদ সামছু। বয়স পঞ্চাশের মতো। চুল-দাড়ি পাকে নি। কিন্তু ভুরু পেকে গেছে। শক্ত-সমর্থ্য শরীর। অনবরত কথা বলা টাইপ। আমি এই ধরনের মানুষের নাম দিয়েছি Perpitual talking machine. ভদ্রলোক গোল জারে দুটা গোল্ডফিশ জাতীয় মাছ নিয়ে এসেছেন। ছুটির দিন। সকাল ন'টায় এসেছেন। আমি কয়েক মিনিট কথা বলেই বুঝেছি। দুপুরের আগে তিনি বিদায় হবেন না।

আপনার নাম মিসির আলি? আপনার শরীরের অবস্থা তো ভালো না। নিশ্চয়ই হজমের সমস্যা। দৈনিক আধঘণ্টা ফ্রি হ্যান্ড একসারসাইজ করবেন। খালি পেটে তিন গ্লাস পানি

খাবেন। ফ্রিজের ঠাণ্ড পানি না। ফ্রিজের পানি আর ইদুর-মারা বিষ একই। ইদুরকে সাত দিন ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি খাওয়াবেন ইদুর মারা যাবে। যদি মারা না যায় আমি কান কেটে আপনার বাসার ঠিকানায় কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দিব। নরমাল পানি খাবেন তিন গ্লাস। থ্রি গ্লাসেস। ভাতের সঙ্গে নিয়মিত কালিজিরা ভর্তা খাবেন। আমাদের নবীজি বলেছেন– কালিজিরা হলো মৃত্যু রোগ ছাড়া সকল রোগের মহৌষধ। রাতে ঘুমানোর আগে ইশবগুলের ভুসি। হার্টের কি কোনো সমস্যা আছে?

না।

না বললে তো হবে না, আপনার যা বয়স হার্টের সমস্যা থাকবেই। ঘরে ঢুকেই বুঝেছি ধূমপান করেন। এশট্রেতে সাতটা সিগারেট। ভয়াবহ। সব আর্টারি ব্লক হয়ে গেছে। তবে চিন্তার কিছু নাই। অর্জুন গাছের ছাল ব্রাতে পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন। সকালে খালি পেটে পানিটা খাবেন। ঘরে দারচিনি নিশ্চয়ই আছে। দারচিনি পাউডার করে রাখবেন। এক চামচ দারচিনির পাউডার মধু দিয়ে মাখিয়ে পেষ্টের মতো বানাবেন। সেই পেষ্ট হাতের তালুতে নিয়ে চেটে চেটে খাবেন। এতে শরীরে ঘাম কিছুটা পেটে যাবে। শরীরের ঘাম শরীরের জন্যে উপকারী।

আমি হঠাৎ ফাঁক পেয়ে বললাম, আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন জানতে পারি?

নিশ্চয়ই জানতে পারেন। কাজে এসেছি। অকাজে আসি নাই। অকাজে সময় নষ্ট করার মানুষ আমি না। আলস্য করে এক মিনিট সময় আমি নষ্ট করি না। কারণ অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। আমি আপনার নাম শুনে এসেছি। শুনেছি। আপনার অনেক বুদ্ধি। সাইকোলজির লোক। আপনার উপর না-কি অনেক বইপত্র লেখা হয়েছে। কিছু মনে

করবেন না, সেই সব বই পড়া হয় নাই। বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া এইসব বদঅভ্যাস আমার নাই। যৌবনে শরৎ বাবুর একটা বই পড়েছিলাম, নাম দেবদাস। তিনটা ভুল বের করেছিলাম। ভুলগুলি কি শুনতে চান?

জি না শুনতে চাচ্ছি না। আমার কাছে কেন এসেছেন সেটা বলুন।

ভদ্রলোক বিরক্ত গলায় বললেন, আপনি এত তাড়াহুড়া করছেন কেন? মানব সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাড়াহুড়ার কারণে। এই জন্যে আল্লাহপাক পবিত্র কোরান শরিফে বলেছেন, হে মানব সম্প্রদায় তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া। যেহেতু তাড়াহুড়া করছেন- মূল কথাটা বলে ফেলি। আমি জারসহ মাছ দুটা আপনাকে দিতে এসেছি। আপনি যদি কিনে নিতে চান সেটা ভালো। আমি যে দামে কিনেছি তার হাফ দামে দিয়ে দিব। প্রতিটি জিনিসের দাম ডিপ্রিসিয়েশন হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে। শুধু জমির দাম বাড়ে। উত্তরায় আমার তিনি কাঠা জমি ছিল। পাঁচ বছর আগে বিক্রি করে এখন মাথার চুল ছিঁড়ছি। এই ভুল মানুষ করে? এখন উত্তরায় বার লাখ করে কাঠা। What a shame.

আমি বললাম, মাছের জন্য আপনাকে কত দিতে হবে?

সামছু গম্ভীর গলায় বললেন, আমি জারটা কিনেছি একশ টাকায় আর মাছের জোড়া কিনেছি। একশ' টাকায়। হাফ প্রাইসে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, একশ' টাকা দিলেই হবে। মাছের এক কোটা খাবার ফ্রি পাচ্ছেন। প্রতিদিন চার দানা করে দিলেই হবে। গাদাখানিক খাবার দেবেন না। খাবার যত বেশি দেবেন। মাছ তত হাগবে। জারের পানি ঘন ঘন বদলাতে হবে।

আমি তাড়াতাড়ি মানিব্যাগ খুলে একশ' টাকা বের করলাম। এই লোক যদি টাকা নিয়ে বিদায় হয় তাহলে জানে বাঁচি।

ভদ্রলোক টাকা পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, আমি মানিব্যাগ ব্যবহার করি না। টাকা-পয়সা সবসময় পকেটে রাখি। কারণ মানিব্যাগ চুরি করা পকেটমারদের জানা সহজ। টাকা চুরি করা সহজ না। ভালো কথা, আপনি যদি মাছ না। কিনতে চান তারপরেও এইটা আপনাকে আমি দিয়ে যাব, মাগনাই দিব। আমার স্ত্রী তাই বলে দিয়েছে। সে আবার আপনাকে নিয়ে লেখা বই পড়ে। তার বই পড়ার নেশা আছে। বইমেলায় গিয়ে গত বছর দুইশ' চল্লিশ টাকার বই কিনেছে। আমি দিয়েছি, ধমক । টাকা তো গাছে ফলে না। কষ্ট করে উপার্জন করতে হয়। ঠিক না?

জি ঠিক।

আমার স্ত্রী মেয়ে খারাপ না আবার ভালোও না। সমান সমান। আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এইটা ভালো আবার আমাকে বোকা ভাবে এইটা খারাপ। দুয়ে মিলে প্লাস এবং মাইনাসে জিরো। আমার স্ত্রী হলো জিরো। এখন কি আপনি শুনতে চান মাছ কেন দিতে চাই? আপনার ভাবভঙ্গিতে তো আবার বিরাট তাড়াহুড়া। মন দিয়ে আমার কথাই তো শুনছেন না। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

আমি বললাম, এই মুহূর্ত থেকে এদিক-ওদিক তাকাব না। আপনার কথা শুনব। বলে শেষ করুন।

মাছ দিতে চাই কারণ এই মাছ দুটা ভালো না, খারাপ। এদের মধ্যে দোষ আছে। বিরাট দোষ। আমি তো এত কিছু জানি না। সরল মনে কাঁটাবন থেকে কিনে এনেছি। জোড়া দেড়শ' টাকা চেয়েছিল, মুলামুলি করে একশ'তে কিনেছি। আমার মেয়ের জন্যে কিনেছি। আমার অধিক বয়সের একমাত্র সন্তান বলেই তার প্রতি মায়া বেশি। তার বয়স তিন বছর। আমি নাম রেখেছি মালিহা। ভালো নাম জাহানারা। মাছ দিয়ে সে খেলবে। পশু-পাখির প্রতি মমতা হবে। পশু-পাখির প্রতি মমতার প্রয়োজন আছে। কথায় আছে না। জীবে দয়া করে যেই জন। সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

মাছ কিনে এনে আমি জাহানারাকে বললাম, মা জাহানারা বেগম। কি বলি মন দিয়ে শোনো- এই দুটা মাছ তোমার। আজ থেকে তুমি এদের মা। ইংরেজিতে Mother, তুমি রোজ এদের খাবার দিবে। সকালে চার দানা। বিকালে চার দানা। বেশিও না কমও না। কম দিলে তারা ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। বেশি দিলে অতি ভোজনে গায়ে চর্বি হবে। অতিরিক্ত চর্বি মানুষের জন্যে যেমন খারাপ মাছের জন্যেও খারাপ। বেশি খাওয়ালে এরা বেশি হাগবে। এইটা বললাম না। শিশুদের নোংরা কথা না বলা উত্তম।

কিছুদিন পরের কথা। জাহানারা আমাকে বলল, ভালো কথা, আমার মেয়ের ডাকনাম মালিহা কিন্তু আমি তাকে সবসময় ভালো নামে ডাকি। এতে গাম্ভীর্য বজায় থাকে। জাহানারা বেগম আমাকে বলল, বাবা! মাছ আমার সঙ্গে কথা বলে। আমাকে বলে জাহানারা কি করে?

আমি মেয়ের কথার কোনো গুরুত্ব দিলাম না। শিশুরা বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলে এতে তাদের কল্পনা শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। কয়েকদিন পরের কথা। জাহানারা বেগম আমাকে বলল, বাবা মাছ বলেছে- তুমি মহা বোকা।

এই কথায় আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। কারণ আমি বুঝলাম। এই কথাটা মাছের কথা না। আমার মেয়ের কথা। সে তার মা'র কাছে শুনেছে। শিশুর কথা শিখে বড়দের শুনে শুনে। আমার এক বন্ধুর ছেলে, নাম জহির। সে দু'বছর বয়সেই সবাইকে 'শালা' বলে। কারণ আমার বন্ধু কথায় কথায় শালা বলে। বাবার কাছে শুনে শুনে শিখেছে। যাই হোক আমি শারীরিক শাস্তির পক্ষের লোক। কথায় আছে spare the cane and spoil the child. বেতের চল উঠে গেছে বলে শিশু সম্প্রদায় এখন টেলিভিশনে আসক্ত হয়ে অধঃপতনের দোরগোড়ায়। ঢাকা শহরে বেত পাওয়া যায় না। আমি মুনশিগঞ্জের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে বেত জোগাড় করে ঘরে রেখেছি। প্রধান শিক্ষকের নাম ইমামউদ্দিন। আমার বন্ধুস্থানীয়। সম্প্রতি উমরা হজ করেছেন। আমার জন্যে এক বোতল জমজমের পানি এবং মিষ্টি তেঁতুল এনেছেন।

যে কথা বলছিলাম, আমি বেত্রাঘাতের মাধ্যমে মেয়েকে কিঞ্চিৎ প্রহার করলাম। এবং ঠিক করলাম মাছ বিদায় করব। যে দোকান থেকে কিনেছিলাম সেখানে কম মূল্যে বিক্রির চেষ্টা করব। তারা যা দিবে সেটাই লাভ। অবাক কাণ্ড দেখি মাছের জার আছে। পানি আছে মাছ দুটা নাই। মাছ যাবে কোথায়? একবার ভাবলাম আমার স্ত্রী লুকিয়ে রেখেছে। পরমুহূর্তেই মনে হলো সে কেন খামাখা লুকিয়ে রাখবে? সে তো জানে না যে আমি মাছ ফেরত দেবার পরিকল্পনা করেছি। তাহলে অন্য কোনো বাড়ির বিড়াল এসে কি মাছ খেয়ে ফেলেছে? এই যখন ভাবছি তখন হঠাৎ দেখি মাছের জারে মাছ ঠিকই আছে। সাতার দিচ্ছে। ডিগবাজি খাচ্ছে।

ঘটনা কিছুই বুঝলাম না। তাহলে কি চোখে ধান্ধা লেগেছিল? তা কি করে হয়। সবার চোখে একসঙ্গে ধান্ধা লাগে কি করে অবশ্য জাদুকর পিসি সরকার একবার সবার চোখে

একসঙ্গে ধান্ধা লাগিয়েছিলেন। ম্যাজিক শো হবে। হল ভর্তি লোক। সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হবার কথা। ন'টা বেজে গেছে। পিসি সরকারের খোেঁজ নেই। দর্শকরা বিরক্ত । হৈচৈ হচ্ছে। এমন সময় পিসি সরকার মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। দর্শকরা চিৎকার করে বলছে- দুই ঘণ্টা লেট। দুই ঘণ্টা লেট। পিসি সরকার বললেন, দুই ঘণ্টা লেট কেন বলছেন? আপনারা ঘড়ি দেখুন। এখন সাতটা বাজে। সবাই নিজের নিজের ঘড়ি দেখল। সবার ঘড়িতে সাতটা বাজে। সবাই একসঙ্গে হাততালি দিল।

এখন ভাই সাহেব। আপনি বলুন মাছ দুটা তো পিসি সরকার না যে ম্যাজিক দেখাবে। অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করলাম। দশদিন পরের কথা, ঘরে তালা দিয়ে সবাইকে নিয়ে বিয়ের দাওয়াত খেতে গিয়েছি। আমার স্ত্রীর বাল্যকালের বান্ধবীর মেয়ের বিয়ে। আমার স্ত্রী চাচ্ছিল একটা শাড়ি দিতে। শাড়ি না দিলে তার না-কি মান থাকে না। আমি তাকে ধমক দিয়ে বলেছি বিয়ের উপহারে মানসম্মান নির্ভর করে না। আড়াইশ' টাকা দিয়ে মন সিরামিকের একটা টি সেট দিয়েছি।

যে কথা বলছিলাম, দাওয়াত খেয়ে বাসায় এসে দেখি মাছ দুটা নাই। আগের মতো হয় কি-না। অর্থাৎ মাছ দুটা ফিরে আসে কি-না এটা দেখার জন্যে অনেকক্ষণ মাছের জারের সামনে আমি এবং আমার স্ত্রী বসে ঘুমের প্রস্তুতি শুরু করলাম। মাছ ফিরে এলো না। তখন মিষ্টি পান খেয়ে ঘুমাতে গেলাম। পান আমি খাই না। দাঁত নষ্ট করে। বিয়ে বাড়িতে পান-সিগারেট দিচ্ছিল। আমি নিয়ে এসেছি। সিগারেটটা রেখে দিয়ে পানটা খেলাম। সিগারেট ধরাব কি ধরাব না ভাবছি। না ধরালে নষ্ট করা হয়। আর ধরলে আয়ু ক্ষয়। এক পত্রিকায় পড়েছি– একটা সিগারেট এক ঘণ্টা আয়ু কমায়। দুটা টান দিয়ে সিগারেট ফেলে দিব এই যখন ভাবছি তখন কাজের মেয়ে এসে বলল, খালুজান মাছ দুইটা ফিরা

আসছে। আমার কাজের মেয়েটার নাম জাইতরি। তাকেও বিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার স্যান্ডেল'ছিড়ে গিয়েছিল। খালি পায়ে তো আর বিয়ে বাড়িতে যাওয়া যায় না। ত্রিশ টাকা দিয়ে স্যান্ডেল কিনে দিয়েছিলাম। স্যান্ডেল সাইজে ছোট হয়েছে বলে অনেকক্ষণ সে ঘ্যানঘ্যান করেছে। আমি কি আর জানি মেয়ে মানুষের পা এত বড় হয়? এইটুকু এক মেয়ে তার এক ফুট লম্বা পা। চিন্তা করেন। অবস্থা। ধাবিড়াতে ইচ্ছা করে।

জাইতরির কথায় মাছের জারের কাছে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি মাছ দুটা ঘুরছে। তখন আমার স্ত্রী বলল, মাছ দুটা মিসির আলি সাহেবকে দিয়ে আসো। তিনি রহস্য সমাধান করবেন। সে-ই কোথেকে যেন আপনার ঠিকানা এনে দিল। রহস্য সমাধানের আমার প্রয়োজন নাই। দোষী মাছ বিদায় করতে পেরেছি। এতেই আমি খুশি। ভাই সাহেব আমি উঠি।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, আমি আক্ষরিক অর্থেই হাঁফ ছাড়লাম। ভদ্রলোক দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, সিগারেটটা রাখেন।

আমি বললাম, কিসের সিগারেট?

বিয়ে বাড়ি থেকে এনেছিলাম যে সেই সিগারেট। ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম। ড্যাম্প হয়ে গেছে মনে হয়। খেতে না চাইলে রেখে দিন। সিগারেটখোর কোনো ভিক্ষুক পেলে দিয়ে দিবেন। অনেক ভিক্ষুক দেখেছি বিড়ি-সিগারেট ফুকে। পেটে নাই ভাত নেশার বেলা ষোল আনা।

ভদ্রলোক বিদায় নেবার দুঘণ্টা পর আবার এসে উপস্থিত। মাছের জার ফেরত চান। তার মেয়ে না-কি মাছের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। মেয়েকে অজ্ঞান অবস্থায় রেখেই তিনি মাছ নিতে সিএনজি ভাড়া করে এসেছেন।

আমার হাতে একশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে তিনি জার হাতে ট্যাক্সিতে উঠলেন। এক মিনিটও দেরি করলেন না।

আমি এই গল্পটি আমার Unsolved খাতায় তুলে রেখেছি কারণ ভদ্রলোক তার চরিত্র, কথার ভেতর পুরোপুরি প্রকাশ করেছেন। এই জাতীয় মানুষ কখনো মিথ্যা বলে না। বানিয়ে কিছু বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার তো প্রশ্নই আসে না। এই চরিত্রের মানুষরা নিজেরা বিভ্রান্ত হতে চায় না, অন্যদেরও বিভ্রান্ত করতে চায় না। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে তারাই সবচে' বেশি বিভ্রান্তিতে পড়ে। তাদের জারের মাছই হঠাৎ কোথাও চলে যায়। আবার ফিরে আসে। বিপুল এই বিশ্বের আমরা কতইবা জানি?

রোগভক্ষক রউফ মিয়া

মিসির আলি গুরুতর অসুস্থ। ২৩১ নম্বর কেবিনে তাঁকে রাখা হয়েছে। শ্বাসনালির প্রদাহ, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে পানি- একসঙ্গে অনেক সমস্যা। পাঁচজন ডাক্তারকে নিয়ে একটা মেডিকেল টিম করা হয়েছে। মেডিকেল টিমের ভাষ্য হচ্ছে, মিসির আলি সাহেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিউজেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হচ্ছে। কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে ২৩১ নম্বর কেবিন খুঁজে বের করলাম। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেখি, মিসির আলি গম্ভীর ভঙ্গিতে বিছানায় বসা। তার হাতে বই। তিনি মন দিয়ে বই পড়ছেন। আমাকে দেখে বই বন্ধ করতে করতে বললেন, যে বইটি পড়ছি তাঁর নাম Windows of the mind. লেখকের নাম Stefan Grey. বিজ্ঞানের নামে অবিজ্ঞানের ব্যবসা। এইসব বই বাজেয়াপ্ত হওয়া দরকার। এবং এ ধরনের বইয়ের লেখকদের কোনো জনমানবহীন দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া দরকার। তাদেরকে সেখানে খাদ্য দেয়া হবে। লেখালেখি করার জন্যে কাগজ-কলম দেয়া হবে। তারা কোনো বই লিখে শেষ করা মাত্র ক্যাম্পফায়ারের আয়োজন করে লেখা পোড়ানো হবে। আবর্জনা মুক্তি উপলক্ষে গানবাজনার উৎসব হবে।

আমি বিছানার পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, শুনেছিলাম। আপনি অসুস্থ। মেডিকেল বোর্ড বসেছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মিসির আলি বললেন, গতকাল দুপুর পর্যন্ত অবস্থা আশঙ্কাজনকই ছিল। এখন পুরোপুরি সুস্থ। বাড়ি চলে যেতে চেয়েছিলাম, ডাক্তাররা যেতে দিচ্ছেন না। আমার অলৌকিক আরোগ্যলাভের ব্যাপারটা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান। আপনার ফলের ঠোঙ্গায় কি আম আছে?

আছে।

কাউকে ডেকে দুটা আম দিন। কেটে এনে দিক। আমি খেতে ইচ্ছা করছে। মারোয়াড়িরা কীভাবে আম খায় জানেন।

না।

তারা রাতে বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে আম খায়।

তারা হলো জৈন সম্প্রদায়ের। তাদের ধর্মগুরুত্ব মহাবীর যে কোনো ধরনের প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন। আমে পোকা থাকলে সেই পোকা ‘হত্যা করা যাবে। না। কাজেই অন্ধকারে আম খাওয়া। দুএকটা পোকা অন্ধকারে যদি খাওয়া হয়ে যায় সেই দৃশ্য দেখা হবে না, কাজেই পাপও হবে না।

আম কেটে মিসির আলি সাহেবকে দেয়ার ব্যবস্থা হলো। তিনি আগ্রহ নিয়ে আম খাচ্ছেন। দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগছে। মরণাপন্ন রোগী দেখব বলে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি- এখন দেখছি রোগী স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল করছে। আমি বললাম, মেডিকেল মিরাকল ঘটল কীভাবে?

মিসির আলি বললেন, মিরাকালের ব্যাখ্যা হয় না। ব্যাখ্যা হলে মিরাকল আর মিরাকল থাকে না। যাই হোক, ঘটনা। কী ঘটেছে আপনাকে বলতে পারি। আমার জীবনের অনেক অমীমাংসিত রহস্যের একটি।

বলুন শুনি।

মিসির আলি বললেন, একটা শর্ত আছে। শর্ত পালন করলে শুনাব।

কী শর্ত?

সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। সিগারেট খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। বারান্দায় দাড়িয়ে সিগারেট টেনে আসব, ডাক্তাররা টের পাবে না। এক প্যাকেট সিগারেট এবং একটা লাইটারের ব্যবস্থা করুন। শরীর নিকোটিনের জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে।

গল্প শোনার লোভে মিসির আলিকে সিগারেট এনে দিলাম। মিসির আলি কেবিনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মহানন্দে সিগারেট টানতে লাগলেন। একজন অ্যাটেনডেন্টকে দরজার সামনে বসিয়ে রাখা হলো। সে দর্শনার্থীদের বলবে— এখন ঢোকা যাবে না। রোগী ঘুমাচ্ছে।

মিসির আলি গল্প শুরু করলেন।

সবাই পত্রিকায় খবর পড়ে। আমি পড়ি বিজ্ঞাপন। একটি জাতির মানসিকতা, সীমাবদ্ধতা, অগ্রগতি সবকিছুই বিজ্ঞাপনে উঠে আসে। একযুগ আগের কথা বলছি- একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল।

যে কোনো রোগ গ্যারান্টি দিয়া অ্যারোগ্য করি। আরোগ্য করিতে না পারিলে মাটি খাব। রউফ মিয়া।

রউফ মিয়া বিজ্ঞাপনের নিচে ঠিকানা দেয়া এবং একটি টেলিফোন নাম্বার দেয়া! টেলিফোন নাম্বারের শেষে লেখা 'অনুরোধে'।

আমি টেলিফোন করে রউফ মিয়াকে ডেকে দিতে অনুরোধ করলাম। যিনি টেলিফোন ধরলেন তিনি ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, ফাজলামি করেন? রউফ মিয়াকে ডাকা ছাড়া আমাদের অন্য কাজকর্ম নাই? আবার যদি টেলিফোন করেন মা-বাপ। তুলে গালি দিব।

আমি রউফ মিয়ার ঠিকানায় চিঠি লিখে তাকে ঢাকায় আসতে বললাম। রউফ মিয়া এলো না, তবে তার কাছ থেকে ছাপানো চিঠি চলে এলো। চিঠির শেষে রউফ মিয়ার আকাবাকা হাতে দস্তখত। লোকটি যথেষ্ট গোছানো তা বোঝা যাচ্ছে। চিঠির উত্তর ছাপিয়েই রেখেছে। চিঠিতে লেখা–

জনাব জনাবা মিসির আলি

সম্মান সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন এই যে, আমার পক্ষে নিজ খরচায় আপনার কাছে যাওয়া সম্ভব নহে। রাহা খরচ বাবদ একশত টাকা মাত্র' পাঠাইলে তুরিত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

রোগের জন্য আমার ফ্রি নিম্নরূপ

জটিল রোগ : পাঁচশত টাকা মাত্র

সাধারণ রোগ : আলোচনা সাপেক্ষে

সত্তরের বেশি বয়সের রোগী : চিকিৎসা করা হয় না।

হাড়ভাঙা রোগী চিকিৎসা করা হয় না।

শিশুদের জন্যে বিশেষ কনসেশনের ব্যবস্থা আছে।

ছাত্রদের জন্যে অর্ধেক কনসেশন। তবে হেডমাস্টার সাহেবের প্রত্যয়ন পত্র লাগবে।

ইতি
আপনার একান্ত বাধ্যগত
রউফ মিয়া

চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমি মানি অর্ডার করে একশ' টাকা পাঠালাম। ইন্টারেটিং একটা চরিত্র দেখার আলাদা আনন্দ আছে।

টাকা পাঠানোর দশ দিনের মাথায় গাঢ় লাল রঙের ব্যাগ হাতে রউফ মিয়া আমার বাড়িতে উপস্থিত। অপুষ্ট শরীরের একজন মানুষ। গ্রাম্য গায়কদের মতো মাথায় বাবড়ি চুল। সব চুল পাকা। চোখে সস্তার সানগ্লাস। ভাদ্র মাসের গরমে গায়ে বুকের বোতাম লাগানো কোট।

ময়লা শার্টের সঙ্গে হাতের ব্যাগের মতো নীল রঙের টাই। তার গা থেকে উৎকট বিড়ির গন্ধ আসছে। রউফ মিয়া বললেন, রোগী কে? আপনি অল্প কথায় রোগ বর্ণনা করেন। অধিক কথার প্রয়োজন নাই। সার্থকতাও নাই। সময় নষ্ট।

আমি বললাম, এত দূর থেকে এসেছেন। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেন। বাথরুমে যান, হাত-মুখ ধোন। দুপুরের খাওয়া নিশ্চয় হয় নাই। আসুন। একসঙ্গে খানা খাই।

রউফ বললেন, গোসলের ব্যবস্থা কি আছে? গরমে কাহিল হয়ে গেছি। আমার সঙ্গে লুঙ্গি-গামছা, তেল-সাবান সবই আছে। রোগী দেখতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হয়। সব ব্যবস্থা সঙ্গে রাখি। দাঁতের খিলাল পর্যন্ত আছে।

আমি বললাম, গোসলের ব্যবস্থা অবশ্যই আছে। আপনি আরাম করে গোসল করুন। তাড়াহুড়ার কিছু নাই।

রউফ বললেন, অবশ্যই তাড়াহুড়া আছে। রাতে লঞ্চে করে চলে যাব ভোলায়। ভোলা থেকে কল পেয়েছি। বিশ্বাস না করলে আপনাকে চিঠি দেখাতে পারি।

আমি বললাম, কেন বিশ্বাস করব না? অবশ্যই বিশ্বাস করছি। যান গোসল সেরে আসুন। সোজা চলে যান। ডান দিকে বাথরুম।

রউফ বললেন, একটা বিড়ি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তারপর বাথরুমে ঢুকব। সিগারেট খাবার সামর্থ্য আমার আছে। বিড়ি খাই কারণ সিগারেট আমাকে ধরে না। তাছাড়া বিড়ি কম ক্ষতিকর। সিগারেটে নানা কেমিক্যাল মিশায়। বিড়ি হচ্ছে নির্ভেজাল তামাক।

রউফ বিড়ি ধরিয়ে বুকে হাত রেখে বিকট শব্দে কাশতে লাগলেন। যিনি গ্যারান্টি দিয়ে অন্যের রোগ সারান, তিনি নিজেই অসুস্থ বলে মনে হলো।

দুপুরে রউফ মিয়া অতি তৃপ্তি করে খেলেন। কেউ সাধারণ খাবার তৃপ্তি করে খাচ্ছে দেখলে ভালো লাগে। আমি মুগ্ধ হয়ে তার খাওয়া দেখলাম। খাদ্য-বিষয়ক। কথা শুনলাম।

এটা কী? করলা ভাজি। সবাই কড়া করে করলা ভাজে। কালো করে ফেলে। আপনার বাবুর্চি সবুজ করে ভেজেছে। অসাধারণ। এই করলা ভাজি দিয়েই এক গামলা ভাত খাওয়া যায়।

ছোট মাছ দিয়ে সজিনা? সঙ্গে আবার কাচা আমি। বেহেশতি খানা। একপদ হলেই চলে! এরকম একটা পদ থাকলে অন্য পদ লাগে না।

ডালের মধ্যে পাঁচফুড়ন দিয়েছে? আবার ধনেপাতাও আছে? স্বাদ হয়েছে। মারাত্মক? ভাই সাহেব, আপনার এই বাবুর্চির হাতে চুমা খাওয়া প্রয়োজন।

খাওয়া শেষ করার পর ভদ্রলোক যে কাজটা করলেন তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি আমার কাজের ছেলে হামিদকে ডেকে বললেন, বাবা, তোমার রান্না খেয়ে অত্যধিক তৃপ্তি পেয়েছি। এই পাঁচটা টাকা রাখো বখশিশ। আমি দরিদ্র মানুষ, এর চেয়ে বেশি দেবার সামর্থ্য নাই। তবে তোমার জন্যে খাস দিলে এখুনি আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করব। হাত তোলো দোয়ায় সামিল হও।

রউফ হাত তুলে দাোয়া শুরু করলেন, হে আল্লাহপাক আজ অতি তৃপ্তি সহকারে যার রন্ধন খেয়েছি। তুমি তাকে বেহেশতে নাসিব করো। যেন সে বেহেশতি খানা খেতে পারে। যে পিতা-মাতা এমন এক বাবুর্চির জন্ম দিয়েছে। তাদেরকেও তুমি বেহেশতে নাসিব করো। আমিন।

দোয়া শেষ হবার পর দেখি হামিদের চোখে পানি। সে চোখ মুছে ফুঁপাতে লাগল।

আমি বললাম, আজ রাতটা আপনি ঢাকায় থেকে যান। হামিদ মাংস রাধুক। সে ভালো মাংস রান্না করে।

রউফ বললেন, আচ্ছা থাকলাম! ভোলার রোগী একদিন পরে দেখলেও ক্ষতি কিছু নাই। এতদিন রোগ ভোগ করেছে, আর একদিন বেশি ভোগ করবে। উপায় কি? সবই আল্লাহপাকের ইশারা। আপনার রোগী সন্ধ্যার পর দেখব। এখন শুয়ে কিছুক্ষণ। ঘুমাব। অতিরিক্ত ভোজন করে ফেলেছি।

রউফ মিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমালেন। আমি হামিদকে বললাম রাতে ভালো খাবারের আয়োজন করতে। পোলাও, খাসির রেজালা, মুরগির কোরমা। বেচারা আরাম করে থাক। দুপুরে অতি সামান্য খাবার খেয়ে যে তৃপ্তির প্রকাশ দেখেছি তা আবার দেখতে ইচ্ছা করছে।

রউফ মিয়া যখন শুনলেন আমার কোনো রোগী নেই, আমি গল্প করার জন্যে তাকে টাকা পাঠিয়ে আনিয়েছি, তখন তিনি খুবই অবাক হলেন। আমি বললাম, ভাই রোগ আপনি কীভাবে সারান?

রউফ মিয়া বললেন, রোগ ভক্ষণ করে ফেলি।

কী করে ফেলেন?

ভাই সাহেব, খেয়ে ফেলি। ভক্ষণ।

আমি বললাম, কীভাবে খেয়ে ফেলেন?

চেটে খেয়ে ফেলি।

আমি বললাম, কীভাবে চেটে খান? ভালোমতো ব্যাখ্যা করুন।

রউফ বললেন, রোগীর কপাল চেটে রোগ খেয়ে ফেলতে পারি। হাতের তালু, পায়ের তালু চেটেও খাওয়া যায়। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ঘাড় চেটে রোগ খাওয়া আমার জন্য সহজ।

ও আচ্ছা।

রউফ দুঃখিত গলায় বললেন, আপনি মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই। অনেকেই করে না। বাংলাদেশে বিশ্বাসী লোক পাওয়া কঠিন। সবাই অবিশ্বাসী। আমার কাছে দুটা সার্টিফিকেট আছে, দেখতে পারেন। আমি ইচ্ছা! করলে ব্যাগভর্তি সার্টিফিকেট রাখতে পারতাম। রাখি নাই। কারণ আমি সার্টিফিকেটের কাঙালি না।

আপনি কিসের কাঙালি?

ভালোবাসার কাঙালী। যে যার কাঙালা হয়। সে সেই জিনিস পায় না।

আপনি পান নাই?

জি না। তবে আপনি ভালোবাসা দেখায়েছেন। আদর করে পাশে নিয়ে ভাত খেয়েছেন। নিজের হাতে প্লেটে তিন বার ভাত তুলে দিয়েছেন। ছোট মাছের সালুন দিয়েছেন দুই বার। সালুনের বাটিতে একটা বড় চাপিলা মাছ ছিল, সেটা আপনি নিজে না নিয়ে আমার পাতে তুলে দিয়েছেন। এমন ভালোবাসা আমারে কেউ দেখায় নাই। ভাই সাহেব, সার্টিফিকেট দুটা পড়লে খুশি হব।

আমি সার্টিফিকেট দুটা পড়লাম। একটি দিয়েছেন নান্দিনা হাইস্কুলের অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার। তিনি লিখেছেন–

যার জন্য প্রযোজ্য

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ব্যতিক্রমী চিকিৎসক মোঃ রউফ মিয়ার চিকিৎসায় নান্দিনা হাইস্কুলের দপ্তরি শ্রীরামের কন্যা সুধা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সে দীর্ঘদিন জটিল জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত ছিল। আমি মোঃ রউফ মিয়ার উন্নতি কামনা করি। সে রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। তাহার নৈতিক চরিত্র উত্তম।

মোঃ আজিজুর রহমান খান
সহকারী প্রধান শিক্ষক
নান্দিনা হাইস্কুল

দ্বিতীয় প্রশংসাপত্রটি উকিল আশরাফ আলি খাঁ দিয়েছেন। এই প্রশংসাপত্রটি ইংরেজিতে লেখা।

I hereby confirm the fact that Mr. Rouf Mia is a genuine diseases eater. He has performed the feat in presence of me.

রউফ মিয়া বললেন, ইংরেজি লেখাটার জোর বেশি। কী বলেন ভাই সাহেব?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

রউফ মিয়া বললেন, উকিল মানুষ তো! অনেক চিন্তাভাবনা করে লিখেছেন।

আমি বললাম, আপনার খবর স্থানীয় কোনো কাগজে আসে নি। এই জাতীয় খবর তো লোকাল কাগজগুলি আগ্রহ করে ছাপায়।

রউফ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, নেত্রকোনা বার্তায় একবার খবর উঠেছিল। পেপার কাটিং হারায়ে ফেলেছি। তবে হারায়ে লাভ হয়েছে। ওরা আমার নাম ভুল করে ছেপেছে। লিখেছে রুব মিয়া। রব আর রউফ কি এক? ফাজিল পুলাপান সাংবাদিক হয়ে বসেছে। আর লিখেছেও ভুল। লিখেছে রব মিয়া অন্যের রোগ খেয়ে জীবনধারণ করেন। তিনি কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন না। খাদ্য গ্রহণ না করলে মানুষ বাঁচে?

আমি বললাম, আপনি বিয়ে করেছেন?

যৌবনকালে বিবাহ করেছিলাম। স্ত্রী মারা গোল কলেরায়। ছেলে একটা ছিল, নাম রেখেছিলাম রাজা মিয়া। সুন্দর চেহারা ছবি ছিল- এই জন্যে রাজা মিয়া নাম। ছেলেটা মারা গেল টাইফয়েডে। রোগ খাওয়া তখন জানতাম না। এইজন্যে চোখের সামনে মারা গেল। রোগ খাওয়া জানলে টাইফয়েড কোনো বিষয় না। চোটে ভক্ষণ করে ফেলতাম।

রোগ খাওয়ার কৌশল কীভাবে শিখলেন?

রউফ মিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমার ছেলে রাজা মিয়া আমারে শিখায়েছে। একদিন ভোর রাতে রাজা মিয়াকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি বললাম, বাবা কেমন আছ? সে বলল, ভালো আছি। আমি বললাম, তোমার কি বেহেশতে নাসিব হয়েছে? সে বলল, জানি না। আমি বললাম, তোমার মা কই? তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় না? সে বলল, না। তারপরেই সে আমারে রোগ খাওয়ার কৌশল শিখায়ে দিল। আমি স্বপ্নের মধ্যেই ছেলেকে কোলে নিয়া কিছুক্ষণ কাদলাম। ঘুম ভাঙার পর দেখি চউখের পানিতে বালিশ ভিজে গেছে।

রউফ মিয়া চোখ মুছতে লাগলেন। একসময় বললেন, আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। আপনি যদি চান রোগ খাওয়ার কৌশল শিখায়ে দিব। তবে আপনারা ভদ্রসমাজ। আপনারা পারবেন না। চট্টাচাটির বিষয় আছে।

রউফ মিয়া দুদিন থেকে ভোলায় রোগী দেখতে গেলেন। ছয় মাস পর তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। এইবারের চিঠি ছাপানো না, হাতে লেখা। তিনি লিখেছেন–

বিরাট আর্থিক সমস্যায় পতিত হইয়াছি। যদি সম্ভব হয় আমাকে দুইশত টাকা কর্জ দিবেন। আমি যত দ্রুত সম্ভব কর্জ পরিশোধ করিব।

ইতি

আপনার অনুগত

রউফ মিয়া (র, ভ)।

পুনশ্চতে লেখা- আমি নামের শেষে র, ভ টাইটেল নিজেই চিন্তা করিয়া বাহির করিয়াছি। র, ভ-র অর্থ রোগ ভক্ষক।

আমি দুশ টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম। এই ধরনের কর্জের টাকা কখনো ফেরত আসে না। তাতে কি। মানুষটার প্রতি আমার এক ধরনের মমতা তৈরি হয়েছে। অবোধ শিশুদের প্রতি যে মমতা তৈরি হয় আমার মমতার ধরনটা সে রকম।

রউফ মিয়া তিন মাসের মাথায় টাকা নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন। দু'দিন থাকলেন। দেখলাম তার স্বাস্থ্য আরো ভেঙেছে। জীবন্ত কঙ্কাল ভাব চলে এসেছে। আমি বললাম, শরীরের এই অবস্থা কেন ভাই?

রউফ মিয়া বললেন, অন্যের রোগ খেয়ে খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে। রোগ খাওয়ার পর বেশি করে দুধ খেতে হয়। দুধ কই পাব বলেন? পনেরো টাকা কেজি দুধ।

আমি বললাম, আসুন আপনাকে ডাক্তার দেখাই।

রউফ মিয়া আঁতকে উঠে বললেন, অসম্ভব কথা বললেন। আমি বিখ্যাত রোগভক্ষক। এখন আমি যদি ডাক্তারের কাছে। যাই, লোকে কী বলবে?

কেউ তো জানছে না।

কেউ না জানুক আপনি তো জানলেন। একজন জানা আর এক লক্ষ জন জানা একই কথা।

রউফ মিয়া শীতের সময় এসেছিলেন। বাজারে নতুন সবজি উঠেছে। তার জন্যে বাজার করলাম। হামিদ অনেক পদ রান্না করল। তিনি কিছুই খেতে পারলেন না। দুঃখিত গলায় বললেন, ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গেছে ভাই সাহেব। মানুষের রোগ ভক্ষণ করে করে এই অবস্থা হয়েছে। যদি সম্ভব হয় এক কাপ দুধ দেন।

আমি বললাম, রোগ খাওয়াটা ছেড়ে দিন।

রউফ বললেন, নিজের ছেলে একটা বিদ্যা শিখায়ে দিয়েছে। মানুষ বিপদে পড়ে আমার কাছে আসে। ভাই সাহেব, কয়েকদিন আগে ছেলেটাকে স্বপ্নে দেখেছি। সে এখনো তার মা'রে খুঁজে পায় নাই। পরকালে বাপ-মা ছাড়া ঘুরতেছে, দেখেন তো অবস্থা!

রউফ মিয়া হঠাৎ বড় বড় করে নিশ্বাস নিতে নিতে শুয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে ঘর্ঘর শব্দ হতে লাগল।

আপনার এ্যাজমা আছে না-কি?

রউফ মিয়া বললেন, আপে ছিল না। সম্প্রতি হয়েছে। একজনের হাঁপানি ভক্ষণ করে এই অবস্থা। আমাকে ধরে ফেলেছে। আপনার ছেলেটাকে একটু বলুন বুকে সরিষার তেল মালিশ করে দিতে। রসুন দিয়ে তোলটা পরম করতে হবে।

হামিদ দীর্ঘ সময় ধরে তেল ঘসিল। এক সময় রউফ মিয়া ঘুমিয়ে পড়লেন।

মিসির আলি থামলেন। আমি বললাম, আপনার রোগ মুক্তির পেছনে কি রোগভক্ষক রউফ মিয়ার কোনো ভূমিকা আছে।

মিসির আলি বললেন, জানি না। এই চিঠিটা পড়ে দেখুন। হামিদ ভোরবেলা চিঠিটা দিয়ে গেছে। রউফ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। চিঠি লিখে বান্দরবান চলে গেছেন। মুরং রাজার এক আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্যে ডাক এসেছে।

আমি চিঠি হাতে নিলাম। চিঠিতে লেখা—

প্রাপক জনাব মিসির আলি।

প্রেরক বিশিষ্ট রোগভক্ষক বাংলার গৌরব রউফ মিয়া।

জনাব,

বান্দরবানের মুরং, রাজার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা উল্লাং প্রশ্ন সাহেবের চিকিৎসার জন্যে অদ্য সকল এগারোটায় রওনা হইব। ঢাকায় আসিয়া আপনার অসুখের খবর শুনিলাম! হামিদকে নিয়ে হাসপাতালে আসিয়া আপনার অচেতন মুখ দেখিয়া মর্মে আঘাত লাগিয়াছে। বিশিষ্ট

রোগভক্ষক, বাংলার গৌরব যাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভ্রাতাতুল্য তাহার এই অবস্থা কেন হইবে?

(বাংলার গৌরব টাইটেল বর্তমানে ব্যবহার করিতেছি। যে দেশের যে নিয়ম। নিজের ঢোল নিজেকেই বাজাতে হয়।)

যাই হোক, আমি আপনার ডান হাত চাটিয়া রোগ সম্পূর্ণই ভক্ষণ করিয়াছি। অবশিষ্ট কিছুই নাই। কিছুদিন শরীর দুর্বল থাকিবে। দধি এবং ফল খাইবেন। কচি ডাবের পানি শরীরের জন্যে রোগমুক্তি সময়ে অত্যন্ত উপকারী।

ইতি

আপনার

অনুগত

মোঃ রউফ মিয়া

বিশিষ্ট রোগভক্ষক

বাংলার গৌরব।

পুনশ্চ : জনাব, ভালো কাগজে একটা প্যান্ড ছাপাইতে কত খরচ পড়িবে সেই অনুসন্ধান নিবেন। প্যাডে। আমার নাম, ঠিকানা এবং টাইটেল লেখা থাকিবে। বাংলার গৌরব লেখা

থাকিবে সোনালি কালিতে। প্যাডের ডান পার্শ্বে আমার ছবি। তিনটি ছবি সঙ্গে দিয়া দিলাম। যেটি পছন্দ হয় সেটি ব্যবহার করিবেন।

তিনটি ছবিরই ক্যাপশন আছে। একটিতে রউফ মিয়ার কানে মোবাইল টেলিফোন। ক্যাপশনে লেখা- রুগীর সঙ্গে বাক্যালপো রত।

দ্বিতীয় ছবিতে তিনি ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে চোখে কালো চশমা। ক্যাপশনে লেখা- কলে যাবার জন্য প্রস্তুত।

তৃতীয় ছবিতে তিনি একটি শিশুর কপাল চাটছেন। ক্যাপশনে লেখা–চিকিৎসা চলাকালীন ছবি।

চিঠি মিসির আলির হাতে ফেরত দিতে দিতে বললাম, আপনার কি ধারণা?

সে সত্যি রোগ খেয়ে ফেলেছে?

মিসির আলি বললেন, রউফ আমার কাছে এসেছিলেন রাত ন'টায়। তিনি পনেরো মিনিটের মতো ছিলেন। এর মধ্যে হাসপাতালে হৈচৈ পড়ে যায়। নার্সডাক্তার মিলে বিরাট জটলা। বুড়ো এক পাগল মেঝেতে বসে কুকুরের মতো আমার হাত চাটছে। তাকে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমার জ্ঞান ফিরে রাত দশটার দিকে। জ্বর তখনি নেমে যায়। রাত বারোটার সময় বুঝতে পারি আমি পুরোপুরি সুস্থ।

আমি বললাম, আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি। আপনার কি ধারণা রোগভক্ষক আপনার রোগ ভক্ষণ করেছে?

মিসির আলি বললেন, জানি না। হিসাব মিলাতে পারছি না। রেইন ফরেস্টের আদিবাসী শমন চিকিৎসকদের মধ্যে রোগীর বুড়ো আঙুল চুষে রোগ আরোগ্যের পন্থা আছে। রেড ইন্ডিয়ানরা গায়ে হাত বুলিয়ে রোগ সারায়। অধ্যাপক মেসমার বডি ম্যাগনেটিজম চিকিৎসার কথা বলতেন। এর কোনোটাই বিজ্ঞান স্বীকার করে। না। যুক্তি স্বীকার করে না। আমি নিজে কঠিন যুক্তিবাদী মানুষ। তারপরেও...।

মিসির আলি রেডিও বন্ড কাগজে প্যাড ছাপিয়েছিলেন। রোগভক্ষক রউফ মিয়ার কাছে সেই প্যাড পৌঁছানো যায় নি। বান্দরবান থেকে ঢাকা ফেরার পথে বাসে বমি করতে করতে তাঁর মৃত্যু হয়। মিসির আলি বন্ধুর মৃত্যুর খবর পান এক মাস পরে।

লিফট রহস্য

মিসির আলি বললেন, লিফটে উঠে কখনো ভয় পেয়েছেন?

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় মহসিন হলের লিফটে এক ঘণ্টার জন্যে আটকা পড়েছিলাম। আমার সঙ্গে জীবনে প্রথম লিফটে উঠেছেন এমন এক বৃদ্ধ ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। আমি নিজে ভয় পাই নি। দিনের বেলা বলেই লিফটে কিছু আলো ছিল। পুরোপুরি অন্ধকার ছিল না। আমি মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললাম, না।

কেউ প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে এমন শুনেছেন?

এক বুড়ো মানুষকে নিজে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেছি।

লিফটে ভয় পাওয়া নিয়ে কোনো গল্প শুনেছেন?

আমি বললাম, একটা গল্প শুনেছি। গল্পের সত্য-মিথ্যা জানি না। এক লোক সাত তলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাবে। লিফটের বোতাম টিপল। লিফটের দরজা খুলল। তিনি ভেতরে ঢুকে হুড়মুড় করে নিচে পড়ে গেলেন। কারণ লিফটের দরজা খুলেছে ঠিকই কিন্তু লিফট আসে নি। মেকানিক্যাল কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।

লিফট নিয়ে কোনো ভূতের গল্প পড়েছেন?

স্টিফেন কিং-এর একটা গল্প পড়েছি। বেশ জমাট গল্প। সায়েন্স ফিকশন টাইপ।

মিসির আলি বললেন, আমি লিফট নিয়ে একটা গল্প বলব। এক তরুণী লিফটে উঠে এমনই ভয় পেল যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। সে এখন এক ক্লিনিকে আছে। তার চিকিৎসা চলছে।

কি দেখে ভয় পেয়েছে?

এখনো পুরোপুরি জানি না। চলুন যাই চেষ্টা করে দেখি মেয়েটার মুখ থেকে কিছু শোনা যায় কি-না। সম্ভাবনা ক্ষীণ। ভয় পেয়ে যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সে ভয় কেন পেয়েছে সেই বিষয়ে মুখ খুলবে না। এটাই স্বাভাবিক।

আমি বললাম, মেয়েটার খোজ পেলেন কীভাবে?

মিসির আলি বললেন, ক্লিনিকের ডাক্তার আমাকে জানিয়েছেন। মেয়েটির ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছেন। মেয়েটা তার আত্মীয়া। বোনের মেয়ে বা এই জাতীয় কিছু।

মেয়েটার নাম লিলি। বয়স ২৪/২৫ বা তারচে' কিছু বেশি। গায়ে হাসপাতালের সবুজ পোশাক। সাধারণ বাঙালি মেয়ে যেমন হয় তেমন। রোগা, শ্যামলা। মেয়েটার চোখ সুন্দর। বিদেশে এই চোখকেই বলে Liquid eyes.

চাদর গায়ে সে জড়সড় হয়ে ক্লিনিকের খাটে বসে আছে। সে দুহাতে একজন বয়স্ক মহিলার হাত চেপে ধরে আছে। শব্দ করে নিশ্বাস ফেলছে। কিছুক্ষণ পর পর ঢোক গিলছে।

মিসির আলি বললেন, মা কেমন আছ?

লিলি তাকাল কিন্তু কোনো জবাব দিল না। বয়স্ক মহিলা বললেন, লিলি কারো প্রশ্নের জবাব দেয় না। শুধু বলে লিফটের ভিতর ভয় পেয়েছি। এর বেশি কিছু বলে না।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি লিলির মা?

জি।

আপনাকেও বলে নি কি দেখে ভয় পেয়েছে?

না। বেশি কিছু জিজ্ঞেসও করি না। এই বিষয়ে জানতে বেশি জোরাজুরি করলে মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে যায়।

মিসির আলি লিলির সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, মা শোনো! তুমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছ বুঝতে পারছি। এখন তুমি লিফটের ভেতরে নেই। লিফটের বাইরে। বাকি জীবন আর লিফটে না উঠলেও চলবে। চলবে না?

এই প্রথম লিলি কথা বলল। বিড়বিড় করে বলল, আমি আর কোনোদিন বিহ্ টব না।

মিসির আলি বললেন, যে লিফটে উঠে তুমি ভয় পেয়েছ। সেখানে তুমি না। উঠলেও অন্যরা উঠবে। তারাও ভয় পেতে পারে। তাদের অবস্থাও তোমার মতো হতে পারে। পারে না?

পারে।

মিসির আলি বললেন, এই কারণেই তোমার ঘটনাটা বলা দরকার। একবার বলে ফেলতে পারলে তুমি নিজেও হালকা হবে। তুমি কি দেখে ভয় পেয়েছ তার একটা ব্যাখ্যাও আমি হয়তোবা দাঁড়া করিয়ে ফেলব।

লিলি স্পষ্ট গলায় বলল, আপনি পারবেন না।

মিসির আলি বললেন, পারব না বলে কোনো কাজে হাত দেব না। আমি সে রকম না। তুমি সে রকম। তুমি ধরেই নিয়েছ- লিফটে কি দেখেছ, তা বলতে গেলে প্রচণ্ড ভয় পাবে বলে বলছি না। তুমি না বললেও কি দেখেছি তা তোমার মাথার মধ্যে আছে। তাকে মুছে ফেলতে পারছি না।

লিলি বলল, আচ্ছা আমি বলব।

মিসির আলি বললেন, ভেরি গুড়। আগে এক কাপ চা খাও তারপর গল্প শুরু করো। কোনো খুঁটিনাটি বাদ দেবে না। লিফটে তুমি একা ছিলে?

আমি আর লিফটম্যান। আর কেউ ছিল না।

লিফটটা কোথায়?

মতিঝিলের এক অফিসে।

তুমি সেখানে কাজ করে?

লিলি বলল, আমি বিবিএ পড়ছি! এই জন্যে একটা ফার্মের সঙ্গে এফিলিয়েশন আছে। সেখানে সপ্তাহে একবার হলেও যেতে হয়। কাগজপত্র আনতে হয়।

মিসির আলি বললেন, গতকাল এই জন্যেই গিয়েছিলো?

মিসির আলি বললেন, গতকাল ছিল শুক্রবার। সব কিছু বন্ধ। বন্ধের দিন তুমি কাগজপত্র আনতে গেলে?

লিলি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। মিসির আলি বললেন, তুমি শুক্রবারে সেই অফিসে যাও?

আপনাকে কে বলেছে?

আমি অনুমান করছি। আমার অনুমান শক্তি ভালো। অফিসের ঠিকানাটা বলো।

আমি আপনাকে কিছুই বলব না।

মিসির আলি মেয়েটির মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার মেয়ে বাসায় ফিরেছে। কখন?

ভদ্রমহিলা বললেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে একজন ডাক্তার টেলিফোন করে লিলির কথা জানান। কে এসে না- কি লিলিকে হাসপাতালে দিয়ে গেছে।

আপনার মেয়ে কোথায় কোন অফিসে যায় আপনি জানেন?

না।

মেয়ের বাবা কোথায়?

বিদেশে। মালয়েশিয়ায় কাজ করেন।

মিসির আলি লিলির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তাহলে কিছুই বলবে না?

লিলি কঠিন গলায় বলল, না।

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, তাহলে যাই। তুমি ভালো থেকো। আরেকটা কথা, মা শোনো— যা করবে ভেবেচিন্তে করবে। হঠাৎ বিপদে পড়া এক কথা আর বিপদ ডেকে আনা অন্য কথা।

লিলি বলল, আপনি যাবেন না। বসুন। আমি সব বলব। মা, তুমি অন্য ঘরে যাও।

ভদ্রমহিলা বললেন, আমি থাকলে সমস্যা কি?

লিলি বলল, তোমার সামনে আমি সব কিছু বলতে পারব না।

মিসির আলি আমাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি কি থাকতে পারবেন?

লিলি বলল, হ্যাঁ পারবেন। উনি লেখক। আমি উনাকে চিনি। আমি আপনাকেও চিনি। আপনাকে নিয়ে লেখা দুটা বই আমি পড়েছি। একটার নাম মনে আছে- মিসির আলির চশমা। সেখানে একটা ভুল আছে। ভুলটা আমি দাগ দিয়ে রেখেছি। এখন মনে নাই।

লিলি সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা শুরু করল। উচ্চারণ স্পষ্ট। বাচনভঙ্গি ভালো। কথা বলার সময় সামান্য মাথা দুলানোর অভ্যাস আছে।

ভালো মেয়ে বলতে আপনারা যা ভাবেন আমি তা-না। আমি খারাপ মেয়ে। যথেষ্ট খারাপ মেয়ে। মতিঝিলের ঐ অফিসে আমি একজন ভদ্রলোকের কাছে যাই। তাঁর নাম ফরহাদ। প্রেম-ভালোবাসা এইসব কিছু না। আমি নিরিবিলি কিছু সময় তার সঙ্গে কাটাই। তার বিনিময়ে টাকা নেই। উপহার দিলে উপহার নেই। আমার যে টাকা-পয়সার অভাব তাও না। বাবা মালয়েশিয়া থেকে ভালো টাকা পাঠান।

আমি শুধু যে ফরহাদ সাহেবের কাছেই যাই তা না, আরো লোকজনদের কাছে যাই। একটা নোংরা মেয়ে তো নোংরা পুরুষদের সঙ্গেই মিশবে। এই দেশে নোংরা পুরুষের কোনো অভাব নেই। বেশিরভাগ নোংরা পুরুষই বিবাহিত। স্ত্রীছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখী জীবনযাপন করে। সুযোগ পেলেই আমার মতো নষ্ট মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে।

একবার এক লোকের সঙ্গে তার স্ত্রী সেজে কক্সবাজারে তিন দিন ছিলাম। মা'কে বলেছি। স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছি।

আমি গায়ের চামড়া বিক্রি করলেও নেশা করি না। মদ, সিগারেট, ড্রাগস কিছুই না। পার্টি মাঝে মাঝে মদ খাওয়ার জন্যে খুব ঝুলাবুলি করে। তারা মনে করে নেশাগ্রস্ত মেয়ের সঙ্গে

শোয়া ইন্টারেষ্টিং। তাদের পীড়াপীড়িতেও রাজি হই না। কক্সবাজারে যে লোকের সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে বলেছিল প্রতি পেগী হুইস্কি খাবার জন্যে সে আমাকে এক হাজার করে টাকা দেবে। তখন শুধু সাত পেগ খেয়ে সাত হাজার টাকা নিয়েছি। এবং ঐ লোকের গায়ে বমি করেছি। তার শিক্ষা সফর হয়ে গেছে।

মিসির আলি আংকেল, এখন বলুন আমি কেমন মেয়ে?

মিসির আলি কিছু বললেন না। লিলি ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম মেয়েটা তার চরিত্রের বিকারগ্রস্ত অংশটির কথা বলে আরাম পাচ্ছে।

লিলি বলল, যাই হোক আসল গল্প বলি। আমি ফরহাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। শুক্রবারে অফিসে একেবারেই লোকজন থাকে না কথাটা ঠিক না, কিছু লোকজন থাকে। কেয়ারটেকার, মালী, ঝাড়ুদার। শুক্রবারে লিফট বন্ধ থাকে। ফরহাদ সাহেব বসেন ছয় তলায়। ছয় তলা পর্যন্ত হেঁটে উঠতে হয়। এই জন্যে শুক্রবারে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। গতকাল গিয়েছিলাম, কারণ তিনি বলেছেন আমাকে একটা মোবাইল সেট দেবেন। আমার একটা দামি মোবাইল সেট ছিল, আই ফোন। সেটা চুরি হয়ে গেছে।

আমি অফিসে পৌঁছলাম। সকাল এগারোটায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাব, খাকি ড্রেস পরা একজন এসে বলল, আপা আপনি কি ফরহাদ সাহেবের কাছে যাবেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

সে বলল, লিফটে করে যান। এত দূর হেঁটে উঠবেন।

লিফট চালু আছে?

সে বলল, আজ চালু আছে। কমার্শিয়াল ব্যাংকে আজ সারাদিন কাজ হবে। তারা খবর দিয়ে একটা লিফট চালু রেখেছেন।

আপনি কি লিফটম্যান

জি আম্পা ।

আপনি আমাকে চিনেন?

নামে চিনি না। আপনি ফরহাদ সাহেবের কাছে প্রায়ই যান এইটা জানি।

আমি বললাম, ইউনিভার্সিটির কাজে আসতে হয়। বিবিএ করছি তো। ফরহাদ সাহেব কোম্পানি-আইন বিষয়ে আমাকে পড়ান।

আমি লিফটম্যানকে নিয়ে লিফটে উঠলাম। সিক্সথ ফ্লোরে বোতাম চাপা। হয়েছে, লিফট কিন্তু থামল না। সাত-আট পার হয়ে নিয়ের দিকে যাচ্ছে। লিফটম্যান ব্যস্ত হয়ে বোতাম চাপাচাপি করছে। আট এবং নিয়ের মাঝখানে লিফট থেমে গেল। লিফটের ভিতরের বাতি নিভে গেল। মাথার উপরে যে ফ্যান ঘুরছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল। লিফটম্যান বলল, খাইছে আমারে, আবার ধরা খাইলাম।

কারেন্ট চলে গেছে না-কি?

বুঝতেছি না। তয় এই জায়গায় লিফট পেরায়ই আটকায়। একবার আটকাইছিল চাইর ঘন্টার জন্য।

সর্বনাশ।

আফা আপনার কাছে মোবাইল আছে না? একটা নাম্কার দিতাছি মোবাইল দেন। লিফট চালুর ব্যবস্থা হইব।

আমার কাছে মোবাইল সেট নাই।

চিন্তার কিছু নাই। টুলের উপরে বসেন।

ঠিক হতে কতক্ষণ লাগবে?

বলা তো আফা মুশকিল। আইজ ছুটির দিন। লোকজন চইলা যাবে জুম্মার নামাজে।

এখন বাজে মাত্র এগারোটা, এখন কিসের জুম্মা?

একটা অজুহাতে আগেভাগে বাইর হওয়া। সবাই অজুহাত খুঁজে।

এ্যালার্ম বেল, এই জাতীয় কিছু নাই?

আছে। মনে হয় নষ্ট। রক্ষণাবেক্ষণ নাই। মাসে একবার সার্ভিসিং করার কথা। তিন মাস হইছে সার্তিসিং নাই।

মনে হলো এক ঘণ্টা বসে আছি, ঘড়িতে দেখি মাত্র সাত মিনিট পার হয়েছে। লিফটম্যানের সঙ্গে গল্প করা ছাড়া সময় কাটানোর কোনো বুদ্ধি নেই। আমি বললাম, আপনার নাম কি?

লিফটম্যান বলল, আমার নাম সালাম। আমার এক ছোটভাই আছে তার নাম কালাম। সেও লিফটম্যান। গুলশানের এক অফিসে কাজ করে। বেতন আমার চেয়ে বেশি পায়। চাইরিশ টাকা বেশি। ওভার টাইম পায়। আমাদের এইখানে ওভারটাইম নাই। ছুটির দিনে কাজে আসছি। একটা পয়সা মিলবে না।

আমি বললাম, লিফটম্যানের চাকরিটা মনে হয় খুব বোরিং, মানে ক্লান্তিকর।

সালাম বলল, উঠানামা, উঠা-নামা। এইটা কোনো চাকরির জাতই না। কি করব বলেন- লেখাপড়া শিখি নাই। তবে আমার ভাই কালাম ক্লাস সিক্স পাস।

আপনি বিয়ে করেছেন?

জে না। বেতন যা পাই তা দিয়া নিজেরই পেট চলে না, সংসার করব কি? তার উপর দেশে টাকা পাঠাইতে হয়। মা জীবিত। তয় আমার ভাই কালাম বিবাহ করেছে। মেয়ের বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুর। তাদের একটা কন্যা আছে। কন্যার নাম রেশমা।

বয়স কত?

ফেব্রুয়ারিতে তিন বছর হবে। মাশাল্লাহ সব কথা বলতে পারে। আমারে ডাকে হাওয়াই চাচু।

হাওয়াই চাচু ডাকে কেন?

তারে যখনই দেখতে যাই— হাওয়াই মিঠাই নিয়া যাই। দশ টাকা করে পিস। এই জন্যে হাওয়াই চাচু ডাকে।

দেখতে কেমন হয়েছে?

মাশাল্লাহ অত্যধিক সুন্দরী হয়েছে। আমি ভাইয়ের বৌরে বলেছি- সবসময় মেয়ের কপালে যেন ফোঁটা দিয়া রাখে। সুন্দরী মেয়ের উপর জ্বিন-ভুতের নজর লাগে। আবার খারাপ মানুষের নজর লাগে। মেয়েটা আপনাকে খুব পছন্দ করে? তার বাপ-মা'র চেয়ে বেশি পছন্দ আমারে করে, এই নিয়া একশ' টেক বাজি রাখতে পারব। গত ঈদে তারে একটা জামা দিয়েছিলাম, নীল জামা। সামনেপিছনে লাল ফুল। এই জামা ছাড়া কিছু পরবে না। জামা খাটো হয়ে গেছে, তারপরেও এইটাই পারবে।

ভালো তো।

নিজে নিজেই ছড়া শিখেছে। তার বাপ-মা যদি বলে ছড়া বলে সে বলবে না। আমি যদি বলি, কইগো চান্সের মা বুড়ি ছড়া বলে। সঙ্গে সঙ্গে বলবে।

আপনি তাকে চান্দের মা বুড়ি ডাকেন?

জি আফা। তয় এখন আমার ভাইও তারে চান্দের মা বুড়ি ডাকে।

আমি ঘড়ি দেখলাম। মাত্র ত্রিশ মিনিট পার হয়েছে। উদ্ধারের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। সালামের ভ্যাতিজির গল্প কতক্ষণ শুনব। আমার এ্যাজমার মতো আছে। বন্ধ ঘরে এ্যাজমা'র টান ওঠে। বন্ধ লিফট। সামান্য আলো। বাতাস নেই! আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। আমার শ্বাস কষ্টের ধরনটা এমন যে একবার শুরু হলে দ্রুত বাড়তে থাকে। আমি হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছি। বুকের ভেতর ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে।

সালাম ভীত গলায় বলল, আফা কি হইছে?

আমি বললাম, নিশ্বাস নিতে পারছি না। আমার শ্বাসকষ্ট আছে। লিফট কিছুক্ষণের মধ্যে চালু না হলে আমি মরে যাব।

তখনই ঘটনোটা ঘটল। দেখি লিফটে আমি একা আর কেউ নাই। আমি কয়েকবার ডাকলাম- সালাম সালাম, তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরেছে তখন দেখি আমি আমার মায়ের বাসায়। এই আমার ভয় পাওয়ার ইতিহাস। মতিঝিল অফিসের ঠিকানা চান? এই নিন ফরহাদ সাহেবের কার্ড।

মিসির আলি বললেন, ঘটনার ব্যাখ্যাটা খুব সহজ। তুমি লিফটে আটকা পড়ে ভয়ে-আতংকে এক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েছি। লিফটম্যান অদৃশ্য হয়ে গেছে এটা তুমি দেখেছ স্বপ্নে। তুমি লিফটম্যানের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বললেই আমার ব্যাখ্যা গ্রহন করবে।

লিলি বিড়বিড় করে বলল, হতে পারে!

মিসির আলি বললেন, এখন কি ভয়টা দূর হয়েছে?

হুঁ।

মিসির আলি বললেন, ভয়টা পুরোপুরি দূর করে মা'র সঙ্গে বাসায় চলে যাও। আর চেষ্টা করো জীবন পদ্ধতিটা বদলাতে।

লিলি বলল, আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি উপদেশের ধার ধারি না।

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই। মা উঠি।

লিলি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এখনো মা ডাকছেন?

মিসির আলি বললেন, একবার যাকে মা ডেকেছি সে সব সময়ের জন্যেই মা।

রাস্তায় নেমেই মিসির আলি বললেন, চলুন লিফটম্যান সালামের সঙ্গে দেখা করে আসি।

আমি বললাম, তার সঙ্গে দেখা করার দরকার কি? আপনি তো সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। বদমেয়েটাও এখন স্বাভাবিক।

মিসির আলি বললেন, সামান্য খটকা আছে।

কি খটকা?

লিলি শক্ত মেয়ে। যখন তখন অজ্ঞান হবার মেয়ে না। তার চেয়েও বড় কথা অজ্ঞান অবস্থায় কেউ স্বপ্ন দেখে না। গভীর ঘুমেও মানুষ স্বপ্ন দেখে না। যখন হালকা ঘুমে থাকে

তখন স্বপ্ন দেখে। তখন চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। একে বলে REM অর্থাৎ Rapid Eye Movement.

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?

আমি নিজেও বুঝতে পারছি না কি বলতে চাচ্ছি। সালামের সঙ্গে দেখা হওয়া জরুরি এইটুকু বুঝতে পারছি।

রাত বাজে দশটা, এখন তাকে পাবেন?

আমার ধারণা সে অফিস বিল্ডিং-এ থাকে। তিন বছর বয়েসি মেয়ে বাচ্চার জন্যে কিছু ভালো জামা-কাপড় দরকার।

সালামকে অফিসেই পাওয়া গেল। সে অফিস ঘিরেই একটা কামরায় দারোয়ানদের সঙ্গে মোস করে থাকে। আমাদের দেখে সে ভীত চোখে তাকাতে লাগল। মধ্য বয়স্ক একজন মানুষ। তার উপর বয়ে যাওয়া ঝড়ে যে ক্লান্ত এবং হতাশ। যার জীবন ছোট্ট লিফট ঘরে আটকে গেছে।

মিসির আলি বললেন, সালাম কেমন আছেন?

সালাম বিড়বিড় করে বলল, জে ভালো আছি।

আপনার ভাই কালামের মেয়েটি কেমন আছে?

ভালো।

তার নাম তো চান্দের মা বুড়ি?

সালাম বলল, আপনারা আমার কাছে কি চান? কারো সাথে আমার কোনো বিবাদ নাই। আমি কোনো দোষ করি নাই।

মিসির আলি বললেন, আমরা খুব ভালো করে জানি আপনি কোনো দোষ করেন নাই। আমরা আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।

আপনারা কি পুলিশের লোক?

মিসির আলি বললেন, আমরা পুলিশের লোক না। আপনি যেমন পুলিশ ভয় পান আমরাও ভয় পাই। আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করাধ। ইচ্ছা হলে জবাব দিবেন, ইচ্ছা না হলে দিবেন না। আমরা চলে যাব।

সালাম ভীত গলায় বলল, যা বলার এইখানে বলেন। এইখানে তো আমি ছাড়া কেউ নাই। আমি আপনাদের সাথে যাব না। স্যার আমি গরিব মানুষ, আমি কোনো দোষ করি নাই। আল্লাহপাকের দোহাই।

মিসির আলি বললেন, শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন কেন? যে অপরাধ করে সে ভয় পায়।

সালাম বলল, গরিব মানুষ অপরাধ না করলেও ভয় পায়। সে গরিব হয়েছে এইটাই তার অপরাধ।

আপনার চান্দের মা'র বুড়ির জন্যে কিছু জামা-কাপড় এনেছি। দেখুন তো পছন্দ হয় কি-না।

সালাম আগ্রহ নিয়ে কাপড়গুলি দেখল। তার মুখের চামড়া শক্ত হয়ে গিয়েছিল এখন সহজ হতে শুরু করল। মিসির আলি বললেন, গত শুক্রবারে একটা মেয়ে আপনার সঙ্গে লিফটে আটকা পড়েছিল। আপনিও ছিলেন তার সঙ্গে, কি হয়েছিল বলুন তো?

সালাম বলল, স্যার আমি উনারে ছোটবোনের মতো দেখেছি। বেতালা কিছু করি নাই।

জানি আপনি বেতালা কিছু করেন নি। কিন্তু কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে যাতে মেয়েটা ভয় পেয়েছে। প্রচণ্ড ভয়। ঘটনাটা বলুন।

সালাম বলল, আমার চাকরি নট হবে না তো স্যার? চাকরি নট হইলে না খায়া মরব।

মিসির আলি হাসলেন। সালাম তার হাসি দেখে ভরসা পেল বলে মনে হলো। সে মেঝের দিকে তাকিয়ে কথা বলা শুরু করল।

যে চাকরি আমার রুটি-রুজি তারে খারাপ বলা ঠিক না। আল্লাহপাক নারাজ হন। কিন্তু স্যার চাকরিটা খারাপ। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত লিফটে উঠা-নমা করি। মাঝখানে আধা ঘণ্টা লাঞ্চের ছুটি। লিফটে থাকি, আমার মনটা থাকে বাইরে।

একদিন লিফটে আমি একা। এগারো তলা থেকে একজন বোতাম টিপেছে। লিফট উঠা শুরু করেছে। আমার মনটা বলতেছে থাকব না। শালার লিফটের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমি লিফটের বাইরে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে দাঁড়ায়ে আছি। কি যে একটা ভয় পাইলাম স্যার। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল! মনে হইল মাথা খারাপ হয়ে গেছে। লিফটের সামনে দাড়িয়ে আছি, এক সময় আমাকে ছাড়া লিফট নামল। এগারো তালার বড় সাহেব নামলেন। আমাকে দেখো ধমক দিলেন। বললেন, কোথায় ছিলো?

আমি বললাম, টয়লেটে।

স্যার এই হলো শুরু। আমি ইচ্ছা করলেই লিফটের বাইরে আসতে পারি। কীভাবে পারি জানি না। লোকজন থাকলে বাইর হই না। ঐ দিন আফার দমবন্ধ হয়ে আসছিল তখন বাইর হইছি। লিফট উপরে নিয়ে গেছি। আফা অজ্ঞান হয়ে ছিল। ফরহাদ স্যারকে খবর দিলাম। উনি আফরে নিয়া হাসপাতালে গেলেন।

আপনার এই ব্যাপারটা আর কেউ জানে?

আমার ছোটভাই কালামরে শুধু বলেছি। সে বলেছে আমার মাথা খারাপ হইছে। আর কিছু না। লিফটের চাকরি বেশিদিন করলে সবারই মাথা খারাপ হয়। স্যার এই আমার কথা। আর কোনো কথা নাই। আর কিছু জানতে চান?

মিসির আলি বললেন, না। আর কিছু জানতে চাই না।

আমরা দু'জন বাসায় ফিরছি। আমি বললাম, এই ঘটনাটা কি আপনার 'Unsolved' খাতায় উঠবে?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ।

ঘটনাটা কি লিলি মেয়েটিকে জানানোর প্রয়োজন আছে?

মিসির আলি বললেন, না।

সিন্দুক

মিসির আলির ঘর অন্ধকার। তিনি অন্ধকার ঘরে চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। চেয়ারে পা তুলে বসে থাকার বিষয়টা আমার অনুমান। অন্ধকারের কারণে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে পা তুলে জবুথবু ভঙ্গিতে বসে থাকা তাঁর অভ্যাস।

আমি বললাম, ঘরে মোমবাতি নাই?

মিসির আলি বললেন, টেবিলে মোমবাতি বসানো আছে। এতক্ষণ জ্বলছিল। আপনি ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ আগে বাতাসে নিভে গেছে।

আমি বললাম, মোমবাতি জ্বালাব? নাকি অন্ধকারে বসে থাকবেন?

মিসির আলি বললেন, থাকি কিছুক্ষণ অন্ধকারে। আঁধারের রূপ দেখি।

বিশেষ কিছু নিয়ে চিন্তা করছিলেন?

মিসির আলি বললেন, আপনার কি ধারণা সারাক্ষণ আমি কিছু-না-কিছু নিয়ে চিন্তা করি? চিন্তার দোকান খুলে বসেছি? পকেটে দিয়াশলাই থাকলে মোমবাতি জ্বালান। একা একা অন্ধকারে বসে থাকা যায়। দুজন অন্ধকারে থাকা যায় না।

কেন?

দুজন হলেই মুখ দেখতে ইচ্ছা করে।

আমি মোম জ্বালালাম। আমার অনুমান ঠিক হয় নি। মিসির আলি পা নামিয়ে বসে আছেন। তাঁকে সুখী সুখী লাগছে। বিয়েবাড়ির খাবার খাওয়ার পর পান মুখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে চেহারায় যে সুখী সুখী ভাব আসে সেরকম।

মিসির আলি বললেন, বিশেষ কোনো কাজে এসেছেন নাকি গল্পগুজব?

গল্পগুজব।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন? আমরা সব সময় বলি গল্পগুজব। শুধু গল্প বলি না। তার অর্থ হচ্ছে আমাদের গল্পে গুজব একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আমাদের গল্পের একটা অংশ থাকবে গুজব। ইংরেজিতে কিন্তু কেউ বলে না। Story Rumour, কারণ Rumour ওদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না।

আমি বললাম, আপনি গল্পই বলুন। গুজব বাদ থাক।

কী গল্প শুনবেন?

যা বলবেন তাই শুনব। আপনার ছেলেবেলার গল্প শুনি। শৈশব-কথা। আপনার বাবা কি আপনার মতো ছিলেন?

আমার মতো মানে?

জটিল চিন্তা করা টাইপ মানুষ।

আমার বাবা নিতান্তই আলাভোলা ধরনের মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রিয় শব্দ হল আশ্চর্য। কোনো কারণ ছাড়াই তার বিস্মিত হবার ক্ষমতা ছিল। উদাহরণ দেব?

দিন।

একবার একটা প্রজাপতি দেখে কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য বলে তার পেছন পেছন জুটলেন। তিনি শুধু যে একা ছুটলেন তা না, আমাকেও ছুটতে বাধ্য করলেন। প্রজাপতির একটা ডানা ছিঁড়ে গিয়েছিল। বেচারা একটা ডানায় ভর করে উড়ছিল।

আমি বললাম, আশ্চর্য হবার মতোই তো ঘটনা।

মিসির আলি বললেন, তা বলতে পারেন। তবে দিনের পর দিন এই ঘটনার পেছনে সময় নষ্ট করা কি ঠিক? তাঁর প্রধান কাজ তখন হয়ে দাঁড়াল প্রজাপতি ধরে ধরে একটা ডানা ছিঁড়ে দেখা সে এক ডানায় উড়তে পারে কি না। শুধু প্রজাপতি না, তিনি ফড়িং ধরেও ডানা ছিঁড়ে দেখতেন উড়তে পারে কি না। বাবার এই কাজগুলো আমার একেবারেই পছন্দ হত না। কৌতূহল মেটানোর জন্য তুচ্ছ পতঙ্গকে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে হয় না।

আপনার বাবার পেশা কী ছিল?

উনি মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। উলা পাস শিক্ষক। যদিও আমাকে তিনি মাদ্রাসায় পড়তে দেন নি। তিনি লম্বা জুব্বা পরতেন। জুঘার রঙ সবুজ, কারণ নবীজি সবুজ রঙের জুম্বা

পরতেন। বাবার ঝোঁক ছিল সত্য কথা বলার দিকে। তাঁর একটাই উপদেশ ছিল, সত্যি বলতে হবে। তাঁকে খুব অল্প বয়সে সত্যি বিষয়ে আটকে ফেলেছিলাম। শুনবেন সেই গল্প?

বলুন শুনি।

আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। বাবা মাগরেবের নামাজ শেষ করে জায়নামাজে বসে আছেন!! এশার নামাজ শেষ করে তিনি উঠবেন। এই আঁর নিয়ম। দুই নামাজের মাঝখানের সময়ে তিনি তসবি টানতেন, তবে সাধারণ কথাবার্তাও বলতেন! সেদিন ইশারায় আমাকে জায়নামাজের এক পাশে বসতে বললেন। আমি বসলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে কিছু দোয়া-দরুদ পড়ে যথারীতি বললেন, বাবা, সত্যি কথা বলতে হবে। সব সময় সত্যি।

আমি বললাম, আচ্ছা বাবা মনে কর তুমি একটা নৌকায় বসে আছ, নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা, তখন একটা মেয়ে দৌড়ে এসে তোমার নৌকার পাটাতনে লুকিয়ে পড়ল। তাকে কিছু দুষ্ট লোক তাড়া করছে। মেয়েটি লুকানোর কিছুক্ষণ পর ডাকাত দল এসে পড়ল। তারা তোমাকে বলল, একটা মেয়েকে আমরা খুঁজছি। তাকে কোনো দিকে যেতে দেখেছেন? তার উত্তরে তুমি কি সত্যি কথা বলবে?

ধাবা কিছু সময় হতাশ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দুষ্ট তর্ক ভালো না বাবা।

মোমবাতি আবার বাতাসে নিভে গেছে। মিসির আলি বাতি জ্বালালেন।

আমি বললাম, আপনার তর্কবিদ্যার সেটাই কি শুরু?

মিসির আলি বললেন, শুরুটা বাবা করে দিয়েছিলেন। তবে তর্কবিদ্যা না। তার ছিল চিন্তাবিদ্যা। চিন্তা বা লজিকনির্ভর অনুমান বিদ্যা।

বলুন শুনি।

মিসির আলি বললেন, বাবার আমার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। দুবছর বয়সে আমার মা মারা গেছেন। মার স্নেহ পাই নি! এ নিয়ে তাঁর মনে কষ্ট ছিল। তিনি আমাকে আনন্দ দেবার জন্য নানান খেলা খেলতেন। প্রধান খেলা ছিল টিনের কোটায় কিছু মার্বেল ঢুকিয়ে ঝাকানো। ঝাকানোর পরে বলতেন-বাবা, বল মার্বেল কয়টা? বলতে পারলে লজেন্স।

আমি যে কোনো একটা সংখ্যা বলতাম। কৌটা খুলে দেখা যেত সংখ্যা ঠিক হয় নি। বাবা বলতেন, যা মনে আসে তাই হুটু করে বলবা না। চিন্তা করে অনুমানে যাবা। যদি একটা মার্বেল থাকে সেই মার্বেল টিনের গায়ে শব্দ করবে। দুটা মার্বেল থাকলে টিনের গায়ে শব্দ হবে, আবার মার্বেলে মার্কেলে ঠোকাঠুকি হয়ে আরেক ধরনের শব্দ হবে। তিনটা মার্বেল থাকলে তিন রকমের শব্দ। মূল বিষয় হল শব্দ নিয়ে চিন্তা। মানুষ এবং পশুর মধ্যে একটাই প্রভেদ। মানুষ চিন্তা করতে পারে, পশু পারে না।

আমি বললাম, বাবা পশুও হয়তো চিন্তা করতে পারে। মুখে বলতে পারে না।

বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আমার কারণে তাকে অনেকবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হয়েছে। সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসে পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় হতাশার চিহ্ন ছিল। বাবার কৃথা বাদ থাকা! আপনি এসেছেন। আমার যে কোনো একটা অমীমাংসিত রহস্যের গল্প শুনতে। তেমন একটা গল্প বলি।

আমি বললাম, আপনার বাবার গল্প শুনতে ভালো লাগছে। বাবার গল্পই বলুন। মার্বেলের শব্দ নিয়ে তাঁর খেলাটা তো শুনতে খুবই ভালো লাগল। কোনো বাবা তার সন্তানকে নিয়ে এ ধরনের খেলা খেলেন বলে মনে হয় না।

মিসির আলি বললেন, অমীমাংসিত রহস্যটা বাবার সিন্দুক নিয়ে। এই অর্থে এটা হবে বাবারই গল্প। শুরু করি?

করুন।

বাবার একটা সিন্দুক ছিল। বিশাল সিন্দুক। লোহা কাঠের তৈরি। লোহা কাঠ কী বস্তু আমি জানি না। বাবা বলতেন—লোহা কাঠ হচ্ছে সেই কাঠ যেখানে লোহার পেরেক ঢুকে না। আমার নিজের ধারণা সিন্দুকটা ছিল সিজন করা বার্মা টিকের। সিন্দুকের গায়ে পিতলের লতাপাতার নকশা ছিল। সিন্দুকের চাবি ছিল দুটা। একটা চাবি প্রায় আধাফুট লম্বা। দুটা চাবিই রুপার তৈরি। চাবি দুটা সব সময় বাবার কোমরের ঘুনাসির সঙ্গে বাধা থাকত। গোসলের সময়ও তিনি চাবি খুলতেন না।

শৈশবে আমি ভাবতাম সিন্দুকে সোনার থালা-বাসন আছে। কারণ প্রায়ই গল্প শুনতাম নদীতে সোনার থালা-বাসন ভেসে উঠেছে। আর্কিমিডিসের সূত্রে পানিতে সোনার থালা-বাসন ভেসে ওঠার কথা না। তবে শৈশব সব রকম সূত্র থেকে মুক্ত।

সিন্দুক প্রসঙ্গে যাই। সিন্দুকের ওপর শীতলপাটি পাতা থাকত। বাবা সেখানে ঘুমাতেন। তিনি কোনো বালিশ ব্যবহার করতেন না। ডান হাতের তালুতে মাথা রেখে ঘুমাতেন। খুব ছেলেবেলায় আমিও বাবার সঙ্গে ঘুমাতাম।

একটু বড় হবার পর বিছানায় চলে আসি, কারণ দুজনের চাপাচাপি হত। বাবা রাতে খুব যে ঘুমাতেন তা না। এবাদত-বন্দেগি করেই রাত পার করতেন। রাতে ঘরে সব সময় হারিকেন জ্বলত। বাবা যা পেতেন। এক রাতের কথা বললেই বুঝতে পারবেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে। ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে সামান্য চাদের আলো আসছে। বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। সামান্য কাঁপছেন। আমি বললাম, বাবা কী হয়েছে?

বাবা বললেন, সর্বনাশ হয়েছে রে। ব্যাটা। হারিকেন নিভে গেছে। কেরোসিন শেষ, আগে খিয়াল করি নাই।

আমি বললাম, মোমবাতি তো আছে।

বাবা মনে হল জীবন ফিরে পেলেন। কঁপা গলায় বললেন, মোমবাতি আছে নাকি? কোনখানে?

আমি শিকায় ঝুলানো হাঁড়ির ভেতর থেকে বাবাকে মোমবাতি এনে দিলাম। তিনি ক্রমাগত বলতে লাগলেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানি।

মোমবাতি জ্বালানো হল। তাকিয়ে দেখি ভয়ে—আতঙ্কে বাবার মুখ পাংশু বর্ণ। কপালে ঘাম। আমি বললাম, তুমি অন্ধকার এত ভয় পাও কেন বাবা?

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আছে ঘটনা আছে। তোকে বলা যাবে না। তুই পুলাপান মানুষ। ভয় পাবি।

এই সময় আমাদের ঘরের পেছন দিকে ধুপধাপ শব্দ হতে শুরু করল। আমি বললাম, শব্দ কীসের বাবা?

বাবা বললেন, খারাপ জিনিস হাঁটাচলা করতেছে। তিনি ক্রমাগত আয়াতুল কুরসি পড়ে আমার গায়ে ফুঁ দিতে লাগলেন।

আপনার বয়স তখন কত?

ক্লাস ফাইভে পড়ি। নয়-দশ বৎসর বয়স হবে। ঘটনাটা মন দিয়ে শুনুন। বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে থারথার করে কঁপিছেন। ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। একনাগাড়ে না। মাঝে মাঝে থামছে। আবার শুরু হচ্ছে। আমি বললাম, বাবা কেউ ঢেকিতে ধান কূটছে। ঢেঁকির শব্দ।

বাবা বললেন, গাধার মতো কথা বলবি না। আমার বাড়ির পেছনে কি ঢেঁকি ঘর?

আমি বললাম, শব্দ দূরে হচ্ছে। রাতের কারণে শব্দ কাছে মনে হচ্ছে।

বাবা বললেন, এত রাতে কে ঢেঁকিতে পাড় দিবে?

আমি বললাম, হিন্দু বাড়িতে সকাল হবার আগেই ঢেঁকি শুরু হয়। এখনই সকাল হবে।

আমার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মসজিদের আজান শোনা গেল। বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, মাশাল্লাহ। মাশাল্লাহ। আল্লাহপাক তোর মাথায় বুদ্ধি দিয়েছেন।

মিসির আলি হিসেবে সেটাই কি আপনার প্রথম রহস্যভেদ?

তা বলতে পারেন। তবে ঢেঁকির শব্দের রহস্যভেদ ছাড়াও ঐ রাতে আমি প্রথম বুঝতে পারি। আমার বাবা অসুস্থ। কী অসুখ জানি না, তবে তিনি যে খুবই অসুস্থ একজন মানুষ সেটা নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলি। এখন আমি বাবার অসুখের নাম জানি, সাইকোলজির ভাষায় এই অসুখের নাম পেরানোয়া! কারণ ছাড়া ভয়ে অস্থির হয়ে যাওয়া। সব সময় ভাবা তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

বাবা মাদ্রাসার চাকরি ছেড়ে দিলেন, কারণ মাদ্রাসায় যেতে হলে সেনবাড়ির ভিটার ওপর দিয়ে যেতে হয়। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা! সেখানে নাকি খারাপ জিনিসরা তাকে ধরার জন্য বসে থাকে। একবার একটায় ধরেও ফেলেছিল। তিনি অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়েছেন।

বাবার বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার একটি গল্প শুনুন। তিনি একবার বাড়িতে মাদ্রাসার এক তালেবল এলেমকে নিয়ে এলেন। আমাকে কানে কানে বললেন, এ কিন্তু মানুষ না, জিন। মানুষের বেশ ধরে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে।

আমি বললাম, কীভাবে বুঝলে?

বাবা বললেন, সবাই জানে। একবার সে মাদ্রাসার হোস্টেলে তার ঘরে শুয়ে আছে। তার একটা বই দরকার। বইটা অনেক দূরে টেবিলের উপর। সে বিছানা থেকে না উঠে হাতটা লম্বা করে টেবিল থেকে বই নিল।

কে দেখেছে?

তার রুমমেট দেখেছে। সে-ই সবাইকে বলেছে।

জিনটার নাম কী?

কালাম। পড়াশোনায় তুখোড় ছাত্র।

জিন কালাম দুপুরে আমাদের সঙ্গে কৈ মাছ খেল। এবং গলায় কৈ মাছের কাটা ফুটিয়ে অস্থির হয়ে পড়ল।

আমি বাবাকে বললাম, বাবা সে জিন। তার গলায় কাঁটা ফুটবে কেন?

বাবা বললেন, মানুষের বেশ ধরে আছে তো। এই জন্য ফুটেছে।

আমি বললাম, এখন কিছুক্ষণের জন্য জিন হয়ে কাঁটা দূর করছে না কেন?

বাবা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, সেটাও একটা বিবেচনার কথা।

মাদ্রাসার চাকরি ছেড়ে বাবা দিনরাত ঘরেই থাকেন। তাঁর প্রধান কাজ সিন্দুক ঝাড়পোছ করা। তেল ঘষা। আগে মাসে একদিন তিনি বাটিতে রেড়ির তেল নিয়ে বসতেন। সিন্দুকে তেল ঘষতেন। এখন প্রতি সপ্তাহে তেল ঘষেন। তবে সিন্দুকের ডালা কখনো খোলেন না। আমি একদিন বললাম, বাবা, সিন্দুকের ভেতর কী আছে?

বাবা বললেন, সিন্দুকে কী আছে তা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি এই সিন্দুকের ধারে কাছে আসবা না। নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকবা। ক্লাস ফাইভে বৃত্ত পরীক্ষা আছে। বৃত্ত যেন পাও সেই চেষতা নাও। তোমার নিজের টাকাতে তোমাকে পড়তে হবে। আমি অক্ষম।

প্রায়ই দেখতাম বাবা সিন্দুকের গায়ে কান লাগিয়ে লাগিয়ে বসে আছেন। যেন সিন্দুকের ভেতর কিছু হচ্ছে। তিনি তাঁর আওয়াজ পাচ্ছেন। এই অবস্থায় আমাকে দেখলে তিনি খুব লজ্জা পেতেন।

ক্লাস ফাইভে কি আপনি বত্তি পেয়েছিলেন?

না। বৃত্তি পরীক্ষাই দেয়া হয় নি। বৃত্তি পরীক্ষার সময় বাবা খুবই অসুস্থ। এখন মারা যান। তখন মারা যান অবস্থা। আমি সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে আছি। বাবার মাথা তখন বেশ এলোমেলো। সিন্দুকের চাবি তার ঘুনসিতে বাধা। তারপরেও দুই হাতে চাবি চেপে ধরে বসে থাকেন। তাঁর একটাই ভয়, খারাপ জিনিসগুলো চাবি চুরি করে নিয়ে সিন্দুক খুলে ফেলবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এক রাতের কথা। বাবার জ্বর খুব বেড়েছে। তিনি সিন্দুকের ওপর ঝিম ধরে বসে আছেন। হঠাৎ আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি তার কাছে গেলাম। বাবা বললেন, সিন্দুকে কান দিয়ে শোন তো দেখি। কিছু কি শোনা যায়?

আমি সিন্দুকে কান রাখলাম।

বাবা বললেন, কিছু শুনতে পাচ্ছিস?

আমি বললাম, হুঁ।

কী শুনা যায়?

বুঝতে পারছি না।

বাবা বললেন, সিন্দুকের ভেতর কেউ কি নূপুর পায়ে হাঁটে?

আমি বললাম, হুঁ।

বাবা বললেন, ভালোমতো শোন। পরিষ্কার করে ফুল। হুঁ-হাঁ না। আমার সময় শেষ। তোকে সিন্দুকের দায়িত্ব বুঝায়া দেয়ার সময় হয়ে গেছে। দায়িত্ব বুঝায়ে দিতে পারলে আমার মুক্তি। তার আগে মুক্তি নাই। কী শুনা যায়, বল।

আমি বললাম, নূপুর পায়ে সিন্দুকের ভেতর কেউ হাঁটছে। থেমে থেমে হাঁটে।

বাবা বললেন, এখন বুঝতে পারছিস কেন সিন্দুকে কান দিয়ে থাকি?

বুঝতে পারছি। সিন্দুক খোলো। দেখি ভেতরে কী।

বাবা রাগী গলায় বললেন, সিন্দুক খোলার নাম মুখেও নিবি না। আমার ব্যাপঞ্জান মৃত্যুর সময় সিন্দুকের দায়িত্ব আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছেন, কখনো যেন সিন্দুক না খুলি। আমি খুলি নাই। তুইও খুলবি না। সিন্দুকের চাবি সারা জীবন সঙ্গে রাখবি।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, বাবা, আমি যখন সিন্দুকে কান চেপে ধরেছিলাম তখন তুমি শরীর দুলাচ্ছিলে। শরীর দুলানোর জন্য সিন্দুকের চাবি ঠুকাঠুকি হয়ে নূপুরের মতো শব্দ হয়েছে।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোর বুদ্ধি মাশাল্লাহ খুবই ভালো। আমার মৃত্যুর পর সিন্দুকে কান চেপে ধরবি। যখনই সময় পাবি তখনই ধরবি। নানান ধরনের শব্দ শুনবি। কিশোরী মেয়ে মানুষের গলা, মেয়েমানুষের হাসি। প্রশ্ন করলে মাঝে মাঝে জবাব পাবি। শুধু একটাই কথা, সিন্দুক খুলবি না।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে বুধবার রাতে বাবা মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে একটাই কথা-সিন্দুকের চাবি। আমার সিন্দুকের চাবি খারাপ জিনিসে নিয়ে গেছে। সর্বনাশ! আমার মহাসর্বনাশ।

তাঁর কোমরের ঘুনসিতে চাবি ছিল না। পুরো বাড়ি তনুতন্ন করে খুঁজেও চাবি পাওয়া গেল না।

বাবার মৃত্যুর পর আমি অর্থই সমুদ্রে পড়লাম। পড়াশুনা বন্ধ হবার উপক্রম হল। তখন আমাদের স্কুলের অঙ্ক স্যার প্রণব বাবু বললেন, তুই আমার বাড়িতে উঠে আয়। এই বাড়ি তালাবদ্ধ থাকুক।

আমি স্যারের বাসায় উঠলাম। স্যারের স্ত্রীর নাম দুর্গা। তিনি আমাকে বললেন, তুই আমার ঠাকুরঘরে কখনো ঢুকবি না। পানি বলবি না, বলবি জল। তা হলেই হবে। এখন আয় আমাকে প্রণাম কর। পায়ে হাত না দিয়ে প্রণাম কর। স্নান করে। এসেছি। ঠাকুরঘরে ঢুকব।

প্রথম দিন মহিলার কথায় আহত হয়েছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝলাম। এই পৃথিবীতে পাঁচজন ভালো মানুষের মধ্যে তিনি একজন। তিনি কখনো বলেন নি আমাকে মা ডাক। কিন্তু আমি তাঁকে মা ডাকতাম। তিনি আমাকে ডাকতেন মিছরি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি মুখাগ্নি করি। কারণ তিনি বলে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর মুসলমান বন্দপুলাটা যেন আমার মুখাগ্নি করে।

তাদের পরিবার কঠিন নিরামিষাশী ছিল। আমাকে নিরামিষ খাবার খেতে হত। আমার আমিষ খাবার অভ্যাস যেন নষ্ট না হয়ে যায় এই জন্য মা আমাকে আলাদা হাঁড়িতে মাঝে মধ্যে ডিম রান্না করে দিতেন। আমার মায়ের গল্প আলাদাভাবে আরেকদিন বলব। আমার unsolved খাতায় উনার ছোট্ট একটা অংশ আছে। উনি প্রতি অমাবস্যায় অপদেবতাদের ভোগ দিতেন। বাড়ির পেছনের জঙ্গলে একটা শ্যাওড়া গাছের নিচে কলাপাতায় করে গজার মাছ পুড়িয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, ভোগ দেবার কিছুক্ষণের মধ্যে একজন অপদেবতা ভোগ গ্রহণ করার জন্য আসতেন। সেই অপদেবতার চোখ নেই। তার শরীরে মাংস পুড়ার

গন্ধ। একদিন আমি মার সঙ্গে অপদেবতাকে ভোগ দিতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, এই অংশটা বাদ। আজি বরং সিন্দুকের গল্পটা করি।

আমি স্কুল ছুটির দিনে নিজের বসতবাড়িতে যেতাম। বাড়ি তালাবদ্ধ থাকত। তালা খুলে ঘর ঝাঁট দিতাম। এবং বেশ কিছু সময় সিন্দুকে কান লাগিয়ে বসে থাকতাম। সিন্দুকের ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ আসত না। আসবে না জানতাম, তারপরেও অভ্যাসবশে কান লাগিয়ে থাকা।

একদিনের কথা। সিন্দুকে কান লাগিয়ে বসে আছি। হঠাৎ শুনলাম রিনারিনে মেয়েদের গলায় কেউ একজন বলল, এই এই। আমি আমি আমি। এই এই।

আতঙ্কে আমার শরীর প্রায় জমে গেল। আমি ছিটকে দূরে সরে গেলাম। মনে হচ্ছে সিন্দূকটা সামান্য নড়ছে। কেউ একজন প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভেতর থেকে সিন্দুকের ডালা খুলার। কেউ একজন বন্দি হয়ে আছে। বের হবার চেষ্টা করছে। দৌড়ে প্রণব স্যারের বাড়িতে চলে গেলাম। ঘর তালাবদ্ধ করার কথাও মনে হল না। সেদিন এতই ভয় পেয়েছিলাম যে রাতে জ্বর এসে গিয়েছিল। জ্বরের ঘোরে কানের কাছে সারাক্ষণ কেউ একজন বলছিল, এই এই এই। আমি আমি আমি। এই এই এই।

পরের সপ্তাহ আবার গেলাম। সিন্দুকে কান লাগানো মাত্র শুনলাম—এই এই এই।

আমি বললাম, আপনি কে?

উত্তরে শুনলাম, আমি আমি আমি।

আপনার নাম কী?

আমি আমি আমি।

সিন্দুকের ভেতর কীভাবে ঢুকলেন? উত্তরে সেই পুরোনো শব্দ-'আমি আমি আমি।' তবে শব্দ স্পষ্ট।

ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। মিসির আলি ফুঁ দিয়ে বাতি নেভালেন। তাকিয়ে দেখি মিসির আলির কপালে ঘাম। তিনি এখনো গল্পের ভেতরে আছেন। যেন চোখের সামনে সিন্দুক দেখছেন।

আমি বললাম, মিসির আলি সাহেব। ভাই, এটা কি কোনো অডিটরি হেলুসিনেশন হতে পারে?

হ্যাঁ, হতে পারে। সিন্দুক নিয়ে আমার কিশোর মনে প্রবল কৌতুহল থেকে ঘোর তৈরি হতে পারে। তবে ঘোর ছিল না।

কীভাবে বুঝলেন ঘোর ছিল না?

আমি আমার মাকে অর্থাৎ প্রণব স্যারের স্ত্রীকে বাড়িতে এনেছিলাম। তাকে বললাম, সিন্দুকে কান রাখতে। তিনি কিছু শুনেন কি না। তিনি কান রাখলেন এবং অবাক হয়ে বললেন, বাচ্চা একটা মেয়ে বলছে- আমি আমি আমি। ঘটনা কী রে?

আমি বললাম, জানি না।

মা বললেন, এর চাবি কই? চাবি আন সিন্দুক খুলব।

আমি বললাম চাবি নাই। চাবি হারিয়ে গেছে।

মা বললেন, আমার ধারণা সিন্দুকে অনেক ধনরত্ন আছে। ধনরত্ন পাহারা দেবার জন্য বাচ্চা কোনো মেয়েকে সিন্দুকের ভেতর ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মেয়েটাকে যাক করা হয়েছে। আগেকার মানুষের বিশ্বাস ছিল যাক ধনরত্ন পাহারা দেয়। মিস্ত্রি দিয়ে সিন্দুক খোলা দরকার কিন্তু সেটা ঠিক হবে না।

ঠিক হবে না কেন?

চারদিকে জানাজানি হবে। সিন্দুক খুলতে হবে গোপনে।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন সিন্দুকের চাবির সন্ধান পাই।

কীভাবে পান?

নিজেই চিন্তা করে বের করি চাবিটা কোথায় থাকতে পারে। চাবি সেখানেই পাওয়া যায়। লজিক্যাল ডিডাকশন কীভাবে করলাম। আপনাকে বলি।

চাবি দুটা বাবার কোমরের ঘূনসিতে বাধা থাকত। কাজেই চাবি পড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না!

বাবার কথামতো খারাপ জিনিস। তাঁর কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নিয়েছে এও হবার কথা না। বাবা নিজেই লুকিয়ে রেখেছেন।

তার শরীর তখন খুবই খারাপ ছিল। কাজেই দূরে কোথাও লুকাবেন না। বাড়ির ভেতর বা বাড়ির আশপাশে লুকাবেন।

মাটি খুঁড়ে কোথাও লুকাবেন না। মাটি খোড়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। আর খোড়াখুঁড়ি করলেই লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

কাজেই তাঁর চাবি লুকানোর একমাত্র জায়গা-ইঁদারা। বাড়ির পেছনেই ইঁদারা। বাবা অবশ্যই ইন্দারার পানিতে চাবি ফেলে দিয়েছেন। আমাদের বাড়ির ইঁদারার চারপাশ বাঁধানো ছিল। অসুস্থ অবস্থায় বাবা ইদারায় হেলান দিয়ে অনেক সময় কাটাতেন।

ইঁদারা থেকে চাবি উদ্ধারের কাজ মোটেই জটিল হয় নি। ইদারায় বালতি বা বদন পড়ে গেলে তা তোলার জন্য আঁকশি ছিল। জিনিসটা একগোছা মোটা বড়শির মতো। দড়িতে বেঁধে আঁকশি ফেলে নাড়াচাড়া করলেই হত। ডুবন্ত জিনিস বঁড়শিতে আটকাত।

আপনি চাবি পেয়ে গেলেন?

হ্যাঁ।

সিন্দুক খুললেন?

হ্যাঁ।

সিন্দুকে কী ছিল?

মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, সিন্দুক ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। কিছুই ছিল না।

কিছুই ছিল না?

এক টুকরা কালো সুতাও ছিল না।

এরপরেও কি আপনি সিন্দুকে কান রেখে কথা শোনার চেষ্টা করেছেন?

করেছি। কিছুই শুনি নি। সিন্দুকের গল্পের এখানেই শেষ। যান, বাসায় চলে যান। অনেক রাত হয়েছে।

সোনার মাছি

'Teleportation' শব্দটার সঙ্গে কি আপনি পরিচিত?

না।

'Talekinetics' শব্দটা শুনেছেন?

না।

Telepathy?

হ্যাঁ শুনেছি। যতদূর জানি এর মনে হচ্ছে মানসিকভাবে একজনের সঙ্গে অন্য আরেকজনের যোগাযোগ।

মিসির আলি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, ঠিকই শুনেছেন। ধারণা করা হয় যখন মানুষ ভাষা আবিষ্কার করেনি। তখন তারা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে যোগাযোগ করত। মানুষের কাছে ভাষা আসার পর টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা নষ্ট হতে শুরু করে।

আমি বললাম, আপনি কি টেলিপ্যাথির কোনো গল্প শোনাবেন?

মিসির আলি বললেন, না। আমি একটা সোনার মাছির গল্প শোনাব। এই মাছিটার Teleportation ক্ষমতা ছিল।

সেটা কী?

মিসির আলি বললেন, মনে করুন। আমার এই চায়ের কাপটা বিছানায় রাখলাম। হাত দিয়ে ধরলাম না। মানসিক ক্ষমতা প্রয়োগ করলাম। কাপটা আস্তে আস্তে আমার দিকে আসতে শুরু করল। একে বলে Telekinetics, আবার মনে করুন কাপটা বিছানাতেই আছে, হঠাৎ দেখা গোল কাপটা টেবিলে। একে বলে Teleportation. সায়েন্স ফিকশনে প্রায়ই দেখা যায় এলিয়েনরা একটা জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে অন্য জায়গায় উদয় হচ্ছেন। পড়েছেন না। এ ধরনের গল্প?

পড়েছি। লেরি নিভানের Window of the Sky বইটিতে আছে।

মিসির আলি বললেন, ম্যাজিশিয়ানরা Telekinetics এবং Teleportation দু'ধরনের খেলাই দেখান। মঞ্চের দু'প্রান্তে দুটা কাঠের খালি বাক্স রাখা হয়েছে। রূপবতী এক তরুণী একটা বাক্সে ঢুকলেন। বাক্স তালা দিয়ে দেয়া হলো। তালা খুলে দেখা গেল মেয়েটি নেই। সে অন্য বাক্সটা থেকে বের হলো। চমৎকার ম্যাজিক। কিন্তু কৌশলটা অতি সহজ।

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, কৌশলটা কী?

মিসির আলি বললেন, সেটা আপনাকে বলব না। আপনাকে কৌশল বলে দেয়ার অর্থ চমৎকার একটা ম্যাজিকের রহস্য নষ্ট করা। কাজটা ঠিক না। বরং সোনার মাছির গল্প শুনুন।

আমি মিসির আলির বাড়িতে এসেছি নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। রাতে বিশেষ কোনো খাবার খাব। যা খেয়ে মিসির আলি আনন্দ পেয়েছেন। তিনি আমাকেও সেই আনন্দ দিতে চান। তিনি খুলনার একটা কাজের ছেলে রেখেছেন। বয়স তোর-চৌদ। নাম জামাল। এই ছেলেটি রান্নায় ওস্তাদ। আজ সে রাধবে কলার মোচা এবং চিংড়ি দিয়ে এক ধরনের ভাজি। কাচামরিচ এবং পেঁয়াজের রস দিয়ে মুরগি। মিসির আলির ধারণা পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ খাবারের তালিকায় এই দুটি আইটেম আসা উচিত।

আমি বললাম, জামাল ছেলেটাকে বেতন যা দিচ্ছেন তা আরো বাড়িয়ে দিন। যাতে সে থেকে যায়। দুদিন পরে চলে না যায়।

মিসির আলি বললেন, বেতন যতই বাড়ানো হোক এই ছেলে থাকবে না। আমার টেলিভিশনটা চুরি করে পালাবে।

কীভাবে বুঝলেন?

মিসির আলি' বললেন, ওর দৃষ্টিতে চোরভাব প্রবল। সে টেলিভিশনের দিকে তাকায় চোরের দৃষ্টিতে। টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখার প্রতি তার আগ্রহ নেই। বন্ধ টেলিভিশনটা সে প্রায়ই চোখ সরু করে দেখে। চুরি যদি নাও করে। বেতনও যদি বাড়াই তারপরেও সে বেশি দিন থাকবে না। কেন বলব?

বলুন।

খুব ভালো যারা রাঁধুনি তার রান্নার প্রশংসা শুনতে চায়। এই প্রশংসা তাদের মধ্যে ড্রাগের মতো কাজ করে। তবে একই লোকের প্রশংসা না। তারা নতুন নতুন মানুষের প্রশংসা শুনতে চায়। এই জন্যেই এক বাড়ির কাজ ছেড়ে অন্য বাড়িতে ঢুকে। ওর কথা থাক গল্প শুরু করি?

করুন।

গল্পটা আমার না। আমার Ph.D থিসিসের গাইড প্রফেসর নেসার অ্যালিংটনের।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনার Ph.D ডিগ্রি আছে না-কি?

হ্যাঁ।

কোনোদিন তো বলতে শুনলাম না।

মিসির আলি বললেন, ডিগ্রি বলে বেড়াবার কিছু তো না। Ph.D দামি কোনো ঘড়ি না যে হাতে পরে থাকব। সবাই দেখবে। আপনার নিজেরও তো Ph.D ডিগ্রি আছে। নামের আগে কখনো ব্যবহার করেছেন?

আমি বললাম, করি নি। কিন্তু আমার এই বিষয়টা সবাই জানে। আপনারটা জানে না।

না জানুক। আমার গাইড প্রফেসর নেসার আলিংটনের কথা দিয়ে শুরু করি। বেঁটেখাটো মানুষ। চমৎকার স্বাস্থ্য। হাসি-খুশি স্বভাব। নেশা হচ্ছে কাঠের অদ্ভুত অদ্ভুত আসবাব বানানো। তিন কোন টেবিল যার এককোেনা ঢালু। টেবিলে রাখলেই গাড়িয়ে পড়ে যায়।

৪৫ ডিগ্রি বাঁকা বুকশেলফ। যার মাথায় খুঁটি বসানো। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা মানুষ মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে আছে। একটা চেয়ার বানিয়েছেন যার দুটা হাতল উল্টোদিকে। আমি একদিন বললাম, এই ধরনের অদ্ভূত ফার্নিচার কেন বানাচ্ছেন স্যার?

তিনি বললেন, মানুষের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যে এগুলি বানাই। মানুষের ব্রেইন এমনভাবে তৈরি যে সে কনভেনশনের বাইরে যেতে চায় না। আমার চেষ্টা থাকে মানুষকে কনভেনশনের বাইরে নিয়ে যাওয়া।

আমি বললাম, স্যার চেয়ারে হাতল থাকে হাত রাখার জন্যে। এটা প্রয়োজন। আপনি প্রয়োজনকে বাদ দেবেন। কেন?

স্যার বললেন, তুমি চেয়ারটায় বসো।

আমি বসলাম।

স্যার বললেন, হাত কোথায় রাখবে এই নিয়ে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে না?

জি হচ্ছে।

স্যার বললেন, চেয়ারটায় হাতল থাকলে তুমি চেয়ারে বসামাত্র তোমার হাতের অস্তিত্ব তুলে যেতে। এখন ভুলবে না। যতক্ষণ চেয়ারে বসে থাকবে। ততক্ষণই মনে হবে তোমার দুটা হাত আছে।

আমি স্যারের কথা ফেলে দিতে পারলাম না। অদ্ভুত মানুষটার যুক্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম। তাঁর সঙ্গে অতি দ্রুত আমার সখ্য হলো। কাঠের ওপর র্যাকা ঘসতে ঘসতে তিনি বিচিত্র বিষয়ে গল্প করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুন্যতম।

এক ছুটির দিনে তাঁর বাড়িতে গেছি। তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে দুটা বই নেয়া দরকার। স্যার কাঠের কাজ বন্ধ করে সুইমিংপুলের পাশের চেয়ারে শুয়ে আছেন। তাঁকে খানিকটা বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। আমি বই দুটির কথা বললাম। তার উত্তরে স্যার বললেন, মিসির আলি চলো সুইমিং করি।

আমি দারুণ অস্বস্তিতে পড়লাম। স্যার একা মানুষ। বিশাল বাড়িতে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সুইমিংপুলে তিনি যখন নামেন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নামেন। নগ্ন অধ্যাপকের সঙ্গে সাঁতার কাটা সম্ভব না। আমি বললাম, স্যার আমার শরীরটা ভালো না। আজ পানিতে নামব না।

স্যার কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, নগ্নতা নিয়ে তোমাদের শুচিবায়ুটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমার স্ত্রী অ্যানি যখন জীবিত ছিল তখন আমরা দু'জন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সীতার কাটতম। আমার জীবনের অল্প কিছু আনন্দময় মুহূর্তের মধ্যে ঐ দৃশ্যটি আছে। এখন আমি একা নগ্ন সীতার কাটি। আমার সঙ্গে সাঁতার কাটে অ্যানির স্মৃতি।

আমি বললাম, স্যার আজ কি ম্যাডামের মৃত্যু দিবস?

তিনি বললেন, তোমার বুদ্ধি ভালো। কীভাবে ধরেছ?

আমি বললাম, ম্যাডামের কোনো কথা কখনো আপনার কাছ থেকে আগে শুনি নি। আজ শুনলাম। আপনি হাসি-খুশি মানুষ, আজ শুরু থেকেই দেখছি আপনি বিষণ্ণ।

স্যার বললেন, মিসির আলি, আমার স্ত্রী ছিল নর্থ আমেরিকার সবচেয়ে রূপবতী মহিলা এবং নর্থ আমেরিকার সবচেয়ে বোকা মহিলা। ঐ বোকা মহিলা আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসত। বোকা বলেই হয়তো বাসত বুদ্ধিমতীরা নিজেকে ভালোবাসে অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারে না। ভালোবাসার ভান করে। তুমি লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে বসো। আমি সাঁতার কেটে আসছি। আজ তুমি আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে। পিজার অর্ডার দেয়া আছে। পিজা চলে আসবে। পিজা অ্যানির অতি পছন্দের খাবার। আমার না। তবে আজকের দিনে নিয়ম করে আমি পিজা খাই।

লাঞ্চপর্ব শেষ হয়েছে। আমি স্যারের সঙ্গে লাইব্রেরি ঘরে বসে আছি। প্রয়োজনীয় দুটা বই আমার হাতে। বিদায় নিয়ে চলে আসতে পারি। আজকের এই বিশেষ দিনে বেচারাকে একা ফেলে যেতেও খারাপ লাগছে। কী করব বুঝতে পারছি না।

স্যার বললেন, তোমার কাজ থাকলে চলে যাও। আমাকে কোম্পানি দেবার জন্যে বসে থাকতে হবে না। নিঃসঙ্গতাও সময় বিশেষে গুড কোম্পানি। আর যদি কাজ না থাকে তাহলে বসো। গল্প করি। অ্যানির বোকামির গল্প শুনবে?

স্যার বলুন।

অ্যানির প্রধান শখ ছিল আবর্জনা কেন। তার শপিংয়ের আমি নাম গার্ব্বেজ শপিং। এই বাড়ির বেসমেন্টের বিশাল জায়গা তার কেনা গার্বেজে ভর্তি। সময় করে একদিন দেখো, মজা পাবে। কি নেই। সেখানে? বাচ্চাদের খেলনা, বাসন, কাচের পুতুল, তোয়ালে, সাবান। সাবান এবং তোয়ালের প্রতি তার ছিল। অবসেশন। সাবান দেখলেই কিনবে। মোড়ক খুলে কিছুক্ষণ গন্ধ শুকবে তারপর রেখে দেবে। তোয়ালের ভাজ খুলে কিছুক্ষণ মুখে চেপে রাখবে। তারপর সরিয়ে রাখবে।

অ্যানিকে নিয়ে আমি প্রায়ই দেশের বাইরে ছুটি কাটাতে যেতাম। বিদেশের নদী, পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র কোনো কিছুই তাকে আকর্ষণ করত না। সে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে মহানন্দে দোকানে দোকানে ঘুরত।

সেবার গিয়েছি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে। আলাদা কটেজ নিয়েছি। সমুদ্রের পানিতে পা ডুবিয়ে বিয়ার খেয়ে সময় কাটাচ্ছি। অ্যানি ঘুরছে দোকানে দোকানে। তার সময় ভালো কাটছে। আমার নিজের সময়ও খারাপ কাটছে না। এক রাতে সে উত্তেজিত গলায় বলল, আজ একটা অদ্ভুত জিনিস কিনেছি, দেখবে?

আমি বললাম, না। তুমি কিনতে থাকো। প্যাকেট করে সব দেশে পাঠাও।

এটা একটু দেখো। একটা সোনার মাছি।

আমি বললাম, সোনার মাছিটা দিয়ে কী করবে? লকেটের মতো গলায় ঝুলাবে? মাছির মতো নোংরা একটা পতঙ্গ গলায় ঝুলিয়ে রাখার কোনো মানে হয়!

অ্যানি বলল, জিনিসটা আগে দেখো। তারপর জ্ঞানী জ্ঞানী কথাগুলি বলো। আমি জিনিসটা দেখলাম। এম্বারের একটা খণ্ড। সিগারেটের প্যাকেটের চেয়ে সামান্য বড়। সেখানে সোনালি রঙের একটা মাছি আটকা পড়ে আছে। এম্বারের নিজের রঙও সোনালি। সূর্যের আলো তার গায়ে পড়লে সে ঝলমল করে ওঠে। মাছিটাও চিকমিক করতে থাকে।

অ্যানি মুগ্ধ গলায় বলল, সুন্দর না?

আমি বললাম, জিনিসটা নকল।

অ্যানি আহত গলায় বলল, মাছিটা নকল?

আমি বললাম, মাছি নকল না, এম্বারটা নকল। চায়নিজরা নকল এম্বার তৈরি করে তার ভেতর কীটপতঙ্গ ভরে আসল বলে বোকাটুরিস্টদের কাছে বিক্রি করে। আসল এম্বারের গুরুত্ব তুমি জানো না। আমি জানি। পৃথিবীর প্রাচীন ফসিলগুলির বড় অংশ হলো এম্বারে আটকা পড়া কীটপতঙ্গ। বিজ্ঞানীদের কাছে এম্বার ফসিল অনেক বড় ব্যাপার।

অ্যানি বলল, এম্বার কী?

আমি বললাম, এক ধরনের গাছের কষ। জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়। পৃথিবীর প্রাচীন সব সভ্যতাতেই এম্বারের গয়নার নিদর্শন পাওয়া গেছে। আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটকে চীন সমাট এম্বারের তৈরি একটি রথ উপহার দিয়েছিলেন।

অ্যানি বলল, জ্ঞানের কথা রাখো। জিনিসটা সুন্দর কি-না বলো?

আমি বললাম, নকল জিনিস সুন্দর হবেই। এর পেছনে কত ডলার খরচ করেছ?

সেটা বলব না। তুমি রাগ করবে।

অ্যানি এম্বারের টুকরা গালে লাগিয়ে হাসিহাসি মুখে বসে রইল।

মিসির আলি! আমি তোমাকে বলেছি না, আমার স্ত্রী নর্থ আমেরিকার সবচেয়ে রূপবতী মহিলা।

জি স্যার বলেছেন।

ঐ রাতে তাকে দেখে আমার মনে হলো সে শুধু নর্থ আমেরিকার না, এই গ্রহের সবচেয়ে রূপবতী তরুণী। কবি হোমার তাকে দেখলে আরেকটি মহাকাব্য অবশ্যই লিখতেন। আমি কোনো কবি না। আমি সামান্য সাইকোলজিষ্ট। আমি অ্যানির হাত ধরে বললাম, I love you.

অ্যানি বলল, I love my golden fly.

আমি সামান্য চমকালাম। আমেরিকান কালচারে স্বামী I love you বলার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও I love you বলতে হয়। অ্যানি তা বলে নি এটা এমন কোনো বড় ব্যাপার না। তবে সাইকোলজিস্ট হিসেবে বুঝতে পারলাম অ্যানি সোনার মাছির প্রতি গভীর আসক্তির পথে যাচ্ছে। অবসেশন খারাপ জিনিস। অবসেশন মানুষের চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বুদ্ধি আচ্ছান্ন করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর সবচেয়ে পাওয়ারফুল ড্রাগের চেয়েও অবসেশন শক্তিশালী।। তুমি একজন সাইকোলজিষ্ট। আমার এই কথা মনে রেখো।

অ্যানির অবসেশন অতি দ্রুত প্রকাশিত হলো। আমি ছোট্ট একটা ঘটনা বলে তার অবসেশনের তীব্রতা বুঝাব। এক রাতের কথা, আমি অ্যানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম অ্যানি তার গালে এম্বারের টুকরোটা চেপে ধরে আছে।

আমি অ্যানির হাত থেকে এম্বারটা কেড়ে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ অ্যানির কাদো কাদো মুখ দেখে নিজেকে সামলালাম। অবসেশন সম্পর্কে ছোট্ট বক্তৃতা দিলাম। সে আমার কোনো কথাই মন দিয়ে শুনছিল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আমার হাতের এম্বারের টুকরাটার দিকে।

আরেকদিনের কথা। হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি। অ্যানি অতি বিরক্তিকর একটা কাজ করছে, চলন্ত গাড়িতে চোখের পাতায় পেনসিল দিয়ে রঙ ঘসছে। অনেকবার তাকে বলেছি। এই কাজটা করবে না। কোনো কারণে গাড়ি ব্রেক করতে হলে চোখ আঁকার পেনসিল ঢুকে যাবে চোখের ভেতর। আমার কথায় লাভ হয় নি। চলন্ত গাড়িতে তার চোখ আঁকা না-কি সবচেয়ে ভালো হয়। আমি অ্যানিকে অগ্রাহ্য করে গাড়ি চালাচ্ছি। সে যা করতে চায় করুক। হঠাৎ অ্যানির বিকট চিৎকার Holy Cow, আমি দ্রুত ব্রেক কষে গাড়ি রাস্তার একপাশে নিয়ে এলাম।

অ্যানি, কী হয়েছে?

অ্যানি বলল, সোনার মাছিটা আমি সবসময় বাসায় রেখে আসি। যদি হারিয়ে যায় সেই ভয়ে। আজও তাই করেছি। এখন ব্যাগ খুলে দেখি এম্বারটা আমার ব্যাগে। আমি বললাম,

তুমি বলতে চোচ্ছ একটা বস্তুর Teleportation হয়েছে। ঘরে অদৃশ্য হয়ে তোমার ব্যাগে আবির্ভূত হয়েছে?

অ্যানি বলল, হুঁ।

আমি বললাম, তোমার ইন্টেলেকচুয়েল লেভেল নিম্নপর্যায়ের। তাই বলে এতটা নিম্ন পর্যায়ের তা আমি ভাবি নি।

অ্যানি বলল, তাহলে এম্বারটা আমার ব্যাগে কীভাবে এসেছে?

তুমি নিজেই এনেছ। এখন ভুলে গেছ। বস্তুটা বিষয়ে তুমি অবসেস্ড্ বলেই ঘটনাটা ঘটেছে।

অ্যানি বলল, হতে পারে। I am sorry.

সে স্যারি বললেও আমি বুঝতে পারছিলাম, অ্যানি আমার যুক্তি গ্রহণ করে। নি। সে ধরেই নিয়েছে সোনার মাছি তার আকর্ষণে আপনাআপনি তার ব্যাগে চলে এসেছে।

কিছুদিন পর আবার এই ঘটনা। অ্যানিকে নিয়ে KMart-এ গিয়েছি। কাগজ কিনব, পেপার ক্লিপ কিনিব। হঠাৎ অ্যানি উত্তেজিত ভঙ্গিতে আমার কাছে উপস্থিত। আমি বললাম, কোনো সমস্যা?

অ্যানি বলল, ই, সমস্যা।

কলো কী সমস্যা।

অ্যানি বলল, শুনলে তো তুমি রেগে যাবে।

রাগব না। বিরক্ত হতে পারি। তোমার সেই সোনার মাছি আবার ব্যাগে চলে এসেছে?

অ্যানি নিচু গলায় বলল, হুঁ। আজ আমি নিজের হাতে এম্বারটা ড্রয়ারে রেখে তোমাকে নিয়ে বের হয়েছি। তুমি ঘরে তালা দিয়েছ।

আমি বললাম, ভালো করে মনে করে দেখো। আমি তালা দেবার পরপর তুমি বললে, কিচেনের চুলা বন্ধ করেছ কি-না মনে করতে পারছি না। আমি তালা খুললাম, তুমি ঘরে ঢুকলে। ঘর থেকে বের হবার সময় সোনার মাছি নিয়ে এসেছি।

অ্যানি বিড়বিড় করে বলল, আমি শুধু কিচেনেই ঢুকেছি। অন্য কোথাও না। বিশ্বাস করো।

আমি বললাম, তুমি ভাবিছ কিচেনে ঢুকেছি। চূড়ান্ত পর্যায়ে অবসেশনে এমন ঘটনা ঘটে।

স্যারি।

আমি বললাম, স্যারি বলার কিছু নেই। তোমাকে সোনার মাছির ব্যাপারটা ভুলে যেতে হবে। পারবে না?

তুমি বললে পারব।

একজন সেনসেবল মানুষ যা করে আমি তাই করলাম, অ্যানির সোনার মাছি লুকিয়ে ফেললাম। অ্যানি তা নিয়ে খুব যে অস্থির হলো তা-না। কারণ তখন তার জীবনে মহাবিপর্যয় নেমে এসেছে। তার ঈমাক ক্যানসার ধরা পড়েছে। তাকে ভর্তি করা হয়েছে সেইন্ট লুক হাসপাতালে। ডাক্তার তৃতীয় দফা অপারেশন করেছেন। রেডিও থেরাপি শুরু হয়েছে।

পরীর চেয়েও রূপবতী একটি মেয়ে আমার চোখের সামনে প্রেতের মতো হয়ে গেল। মাথার সব চুল পড়ে গেল। শরীর শুকিয়ে নয়-দশ বছর বয়েসি একটা শিশুর মতো হয়ে গেল। শুধু চোখ দুটা ঠিক রইল। পৃথিবীর সব মায়া, সব সৌন্দর্য জমা হলো দুটা চোখে। একদিন ডাক্তার বললেন, স্যারি প্রফেসর। রেডিও থেরাপি আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে কাজ করছে না।

আমি বললাম, আর কিছুই কি করার নেই?

ডাক্তার চুপ করে রইলেন।

এক রাতের কথা। আমি অ্যানির পাশে বসেছি। অ্যানি বলল, অন্যদিকে তাকিয়ে বসো। আমার দিকে তাকিও না। আমি দেখতে পশুর মতো হয়ে গেছি। একটা নোংরা পশুর দিকে তাকিয়ে থাকার কিছু নেই। তুমি যখন জ্ঞানের কথা বলতে আমি খুব বিরক্ত হতাম, আজ একটা জ্ঞানের কথা বলো।

আমি বললাম, বিজ্ঞান বলছে মহাবিশ্বের entropy বাড়ছে। তাই নিয়ম। বাড়তে বাড়তে entropy তার শেষ সীমায় পৌছবে। পুরো universer-এর মৃত্যু হবে। তোমার জন্যে

আমার ভালোবাসা সেদিনও থাকবে। তুমি নোংরা পশু হয়ে যাও কিংবা সরীসৃপ হয়ে যাও তাতে কিছু যায় আসে না।

অ্যানি আমার হাতে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কান্দল। তারপর বলল, কিছুক্ষণের জন্যে আমার সোনার মাছিটাকে কি আমার কাছে দেবে? আমি একটু আদর করে তোমার কাছে ফেরত দেব। কোনোদিন চাইব না। প্রমিজ।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কারণ এম্বার খণ্ডটা আমার কাছে নেই। নিতান্তই মূর্খের মতো আমি ফেলে দিয়েছিলাম হাডসন নদীতে। আমি নিশ্চিত জানতাম ঘরে কোথাও লুকিয়ে রাখলে অ্যানি কোনো না কোনোভাবে খুঁজে বের করবে। তার অবসেশন সে শেষ সীমায় নিয়ে যাবে। এখন আমি কী করি? মৃত্যুপথযাত্রীকে কী বলব?

আমি কিছুই বললাম না। মাথা নিচু করে বাসায় ফিরলাম। তার একদিন পর হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এলো। অ্যানির অবস্থা ভালো না। তুমি চলে এসো। সে তোমাকে খুব চাইছে।

আমি হাসপাতালে ছুটে গেলাম। অ্যানিকে দেখে চমকালাম। হঠাৎ করে তাকে সুন্দর লাগছে। গালের চামড়ায় গোলাপি আভা। চোখের মণি পুরনো দিনের মতো বকাঝকা করছে।

আমাকে দেখে সে কিশোরীদের মিষ্টি গলায় বলল, থ্যাংক য়ু।

আমি বললাম, থ্যাংকস কেন? অ্যানি বলল, আমি যখন ঘুমুচ্ছিলাম তখন তুমি আমাকে না জাগিয়ে সোনার মাছিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছ। এইজন্যে ধন্যবাদ।

সে গায়ের চাদর সরাল, আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখি এম্বারের টুকরাটা তার হাতে।

প্রফেসর কথা বন্ধ করে চুরুট ধরালেন। চুরুটে টান দিয়ে আনাড়ি স্মোকারদের মতো কিছুক্ষণ কাশলেন। তারপর ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, এম্বারের টুকরাটা অ্যানির হাতে কীভাবে এসেছে আমি জানি না। জানতে চাইও না। সব রহস্যের সমাধান হওয়ার প্রয়োজনও দেখছি না। রহস্য হচ্ছে গোপন ভালোবাসার মতো। যা থাকবে গোপনে।

মিসির আলি বললেন, স্যার, এম্বারের টুকরাটা কি এখন আপনার কাছে আছে?

প্রফেসর বললেন, না। অ্যানির কফিনের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। অ্যানি তার সোনার মাছি সঙ্গে নিয়ে গেছে।

অ্যানির ছবি দেখবে? দেয়ালে তাকাও। বাসকেট বল হাতে নিয়ে হাসছে। ছবিটা আমার তোলা। ছবিটা প্রায়ই দেখি এবং অবাক হয়ে ভাবি, আমাদের সবার বয়স বাড়বে। আমরা জরাগ্রস্ত হব। কিন্তু ছবির এই মেয়েটি তার যৌবন নিয়ে স্থির হয়ে থাকবে। জরা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

প্রফেসর চুরুট হাতে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুত ঘর থেকে বের হলেন। তাঁর চোখে পানি চলে এসেছে। তিনি সেই পানি তাঁর ছাত্রকে দেখাতে চান না।
হামা–ভূত

বাংলাদেশে। কত ধরনের ভূত আছে জানেন?

আমি বললাম, জানি না।

মিসির আলি বললেন, আটত্রিশ ধরনের ভূত আছে- ব্রহ্মদৈত্য, পেত্নি, শাকচুন্নি, কন্ধকাটা, মামদো, পানি ভূত, কুয়া ভূত, কুনি ভূত, বুনি ভূত।

কুনি ভূতটা কি রকম?

মিসির আলি বললেন, ঘরের কোনায় থাকে বলে এদের বলে কুনি ভূত। আরেক ধরনের ভূত আছে। এরা কোনো শরীর ধারণ করতে পারে না। শুধুই শব্দ করে। নিশি রাতে মানুষের নাম ধরে ডাকে। আরেক ধরনের ভূত আছে নাম 'ভুলাইয়া। এরা পথিককে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যায়। শেষ সময় বিলের পানিতে ডুবিয়ে মারে।

আমি বললাম, ভূত নিয়ে আপনার স্টকে কোনো গল্প আছে?

মিসির আলির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো গল্প আছে। তিনি নড়েচড়ে বসলেন। সিগারেট ধরালেন।

হামা-ভূতের নাম শুনেছেন?

না তো।

হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে বলেই এই ভূতের নাম হামা-ভূত। আট-ন বছর বয়েসি বালকের মতো শরীর। চিতা বাঘের মতো গাছে উঠতে পারে। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। শো শো শব্দ করে। আপনি কখনো হামা-ভূত দেখেছেন?

আমি বললাম, সাধারণ কোনো ভুতই এখনো দেখিনি। হামা-ভূত দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। আপনি দেখেছেন?

মিসির আলি বললেন, শুধু যে দেখেছি তা না। হামা-ভূতকে পাউরুটি খাইয়েছি।

ভূত পাউরুটি খায়?

অন্য ভূত খায় কি-না জানি না, হামা-ভূত খায় এবং বেশ আগ্রহ করেই খায়। গল্প শুনতে চান?

অবশ্যই চাই।

হামা-ভূতের গল্পটা হলো প্রস্তাবনা। তবলার টুকটাক। মূল গল্প অসাধারণ, আমার Unsolved ক্যাটাগরির। হামা-ভূত না দেখলে মূল গল্পের সন্ধান পেতাম না। যাই হোক শুরু করি—

পত্রিকায় পড়লাম নেত্রকোনার সান্ধিকোনা অঞ্চলে হামা-ভূতের উপদ্রব হয়েছে। যারা এই ভূত দেখেছে তারা সবাই অসুস্থ হয়ে সদর হাসপাতালে আছে। অঞ্চলের লোকজন সন্ধ্যার

পর ঘর থেকে কেউ বের হয় না। হামা-ভূতের বিশেষত্ব হচ্ছে- সে মুহুর্তের মধ্যে অদৃশ্য হতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে গাছে ওঠে। যেসব বাড়িতে নবজাতক শিশু আছে সেই সব বাড়ির চারপাশে বেশি ঘোরাঘুরি করে।

আমার তখন বয়স কম, আদিভৌতিক বিষয়ে খুব আগ্রহ। হামা-ভূত দেখার জন্যে ঢাকা থেকে রওনা হলাম। বাংলাদেশের গ্রামে অজানা জন্তুর আক্রমণের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। ভূতের আক্রমণের খবর তেমনভাবে আসে না।

সান্ধিকোনা গ্রামে সন্ধ্যার আগে আগে পৌঁছলাম। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নির্ভেজাল গ্রাম। একটা স্কুল আছে, ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ানো হয়। স্কুলের দু'জন শিক্ষক ছিলেন, বেতন না পেয়ে একজন চলে গেছেন। যিনি টিকে আছেন তার নাম প্রকাশ ভট্টাচার্য।

আমি হামা-ভূত দেখতে এসেছি। এই খবর রুটে গেল। দলে দলে লোকজন আমাকে দেখতে এলো। যেন আমি ফিলোর কোনো বড় তারকা, পথ ভুলে এখানে চলে এসেছি।

প্রত্যন্ত গ্রামের প্রধান সমস্যা একই ধরনের প্রশ্নের জবাব বারবার দিতে হয়।

আপনার নাম?

দেশের বাড়ি?

সার্ভিস করেন?

বেতন কত পান?

শাদি করেছেন?

নতুন যেই আসছে সে-ই এসব প্রশ্ন করছে। রাত কোথায় কটাব এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা নিচু গলায় চলতে লাগল। সাধারণত গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মানুষের বাড়িতে বিদেশি মেহমান রাখা হয়। সম্ভবত এই গ্রামে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নাই। আব্বাস আলি নামের একজনের কথা কয়েকবার শোনা গেল। তবে তার বাড়িতে আজ অসুবিধা। শ্বশুরবাড়ির অনেক মেহমান হঠাৎ করে চলে এসেছে। সুরুজ মিয়ার নাম উচ্চারিত হলো। তাঁর বাড়িতেও সমস্যা। তার ছোটমেয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে।

আমি বললাম, আমার রাতে থাকা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি সঙ্গে করে সিপিং ব্যাগ নিয়ে এসেছি। গাছতলায় থাকব।

গাছতলায় থাকবেন! কি কন? গ্রামের ইজ্জত আছে না। আপনি বিদেশি মেহমান।

আমি বললাম, ভাই ভূত দেখতে এসেছি। রাতে যদি কোনো বাড়িতে ঘুমিয়েই থাকি ভূতটা দেখব কি ভাবে? সারারাত আমি জেগেই থাকিব, হাঁটাহাঁটি করব।

গ্রামের এক মুরব্বি বললেন, সাথে কি তিন-চাইরজন জোয়ান পুলাপান দিব? অলঙ্গ নিয়া আপনার সাথে থাকব।

অলঙ্গা জিনিসটা কি?

ব্ররশা। তালগাছ দিয়া বানায়।

আমি বললাম, একগাদা লোক সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে তো ভূত দেখা দিবে না। বর্শা দিয়ে ভূত গাথাও যাবে না। আমাকে একই ঘুরতে হবে। আর আমার রাতের খাবার নিয়েও চিন্তা করবেন না। আমি রাতের খাবার, পানি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

মুরুব্বি বললেন, এইটা কেমন কথা! চাইরটা ডাল-ভাত আমাদের সাথে খাবেন না?

আমি বললাম, আবার যদি কোনোদিন আসি তখন খাব।

আমার কাছে মনে হলো মুরুব্বি এবং মুরুব্বির সঙ্গে অন্যরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

প্রশান্ত ভট্টাচার্য বললেন, কোনো কারণে ভয় পেলে আমার বাড়িতে উঠবেন। ঐ যে টিনের বাড়ি। আমি বলতে গেলে সারারাত জগন্নাই থাকি। রাতে ঘুম হয় না।

ভূতের ভয়ে ঘুম হয় না?

তা না। এমিতেই ঘুম হয় না। ভগবানের নাম জপে রাত পার করি। অনেক আগে থেকেই করি।

গ্রামের লোকজন হামা-ভূতকে যথেষ্টই ভয় পেয়েছে বুঝা যাচ্ছে। সন্ধ্যার পর যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়ল। গল্প-উপন্যাসে শাশানপুরীর উল্লেখ থাকে। সান্ধিকোেনা শশানপুরী হয়ে গেল। আমি একা একা ঘুরছি। চমৎকার লাগছে!

ভাদ্র মাস। এই সময়ে যতটা গরম হবার কথা ছিল তত গরম না। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। মেঘমুক্ত আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে। মোটামুটি পরিষ্কারভাবেই চারপাশ দেখা যাচ্ছে।

গ্রামের একটাই পুকুর। ভাঙ্গা পাকা ঘাট। পুকুরের চারপাশে গাছপালায় ঢাকা। একদিকে কালিমন্দির আছে। এই অঞ্চলে গ্রামের পটভূমিতে সিনেমা বানালে পুকুরঘাট অবশ্যই ব্যবহার করা হতো।

বিশাল অশ্বথ গাছ দেখলাম। অশ্বখ গাছের নিচে জমাট অন্ধকার। কিছুক্ষণ গাছের নিচে দাঁড়ালাম। গ্রামদেশে ভাদ্র মাসে বেশ কিছু মানুষ সাপের কামড়ে মারা যায়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্তের ভেতর থেকে সাপ বের হয়ে আসে। ভাদ্রআশ্বিন দু'মাস বেশিরভাগ প্রাণীর মেটিং সিজন। সাপেরও তাই। এই সময়ে সাপ মানুষকে আশেপাশে দেখতে পছন্দ করে না।

আমার পায়ে রাবারের গাম বুট। সাপের ভয় এই কারণে পাচ্ছি না। জনমানবশূন্য গ্রাম দেখতে ভালো লাগছে।

অশ্বখ গাছের ডালে প্রচুর হরিয়াল বাসা বেঁধেছে। তাদের ডানার ঝটপট শব্দ শুনতে শুনতেই আমি হামা-ভূত দেখলাম। দেখতে মানুষের মতো। হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে আসতে আসতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

উত্তেজিত স্নায়ু ঠাণ্ড করাঝার জন্যে আমি সিগারেট ধরলাম। অদৃশ্য হামাভূত আবার দৃশ্যমান হলো এবং আমার দিকে মুখ করে বসল। কাঁধের ঝোলা থেকে এক পিস পাউরুটি বের করে দিলাম। সে পাউরুটিটা আগ্রহ করে খেল।

আমি রওনা হলাম প্রশান্ত বাবুর বাড়ির দিকে। হামা-ভূত আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগিল। শোঁ শোঁ শব্দ করেই সে আসছে।

প্রশান্ত বাবু জেগেই ছিলেন। দরজায় ধাক্কা দিতেই তিনি হারিকেন হাতে দরজা খুললেন। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ভূত দেখেছেন?

আমি বললাম, শুধু যে দেখেছি তা না। সঙ্গে করে নিয়েও এসেছি। ঐ যে দেখুন।

হে ভগবান। এটা তো একটা কুকুর।

আমি বললাম, এমন এক কুকুর যার অদৃশ্য হবার ক্ষমতা আছে। এ অদৃশ্য হতে পারে।

কি বলেন। আপনি?

আমি ঝোলা থেকে পাউরুটি বের করে ছুড়ে দিলাম। কুকুর পাউরুটি নিতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভয়ে-আতংকে প্রশান্ত বাবুর হাত থেকে হারিকেন পড়ে গেল। তিনি নিজেও পড়ে যেতেন, আমি তাকে ধরে বললাম, চলুন। ঘরে বসি। ঘটনা ব্যাখ্যা করি।

ঘটনা সাধারণ। কুকুরটা ধবধবে সাদা রঙের। কেউ একজন তার গায়ে ভাতের মাড় বা গরম পানি ফেলেছে। তার একদিক ঝলসে লোম পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কুকুরের নাকটা কালো, নাকের কিছু উপর থেকে সাদা রঙ। তার মুখের দিকে তাকালে লম্বা ভাবটা বুঝা

যায় না। খানিকটা মানুষের মতো মনে হয়। কুকুরের ল্যাজেটাও একটা সমস্যা করেছে। তার ল্যাজে নেই। ল্যাজ কাটা কুকুর।

দিনের বেলাতেও এই কুকুর নিশ্চয়ই ঘুরে বেড়ায়, কেউ তাকে গুরুত্ব নিয়ে দেখে না। রাতের অল্প আলোয় সে হয়ে ওঠে রহস্যময়। সে যখন ঘুরে দাঁড়ায় তখন হঠাৎ তার গায়ে সাদা অংশের জায়গায় কালো অংশ চলে আসে। ভীত দর্শকের কাছে কুকুর হয়ে যায় অদৃশ্য।

ম্যাজিশিয়ানরা কালো ব্যাক গ্রাউন্ডের সামনে কালো বস্তু রেখে বস্তুটাকে অদৃশ্য করার খেলা দেখান। একে বলে ব্ল্যাক আর্ট। আপনাদের এই কুকুর নিজের অজান্তেই ব্ল্যাক আর্টের খেলা দেখাচ্ছে।

প্রশান্ত বাবু মুগ্ধ গলায় বললেন, আপনার কথা শুনে মন জুড়ায়েছে। জটিল একটা বিষয়কে পানির মতো করে দিলেন। ভগবান আপনার মাথায় অনেক বুদ্ধি দিয়েছেন।

আমি বললাম, মাথাটাই কিন্তু আমাদের বড় সমস্যা। আপনাকে বুঝিয়ে বলি। মানুষের মস্তিষ্কের দু'টা প্রধান ভাগ। ডান ভাগ এবং বাম ভাগ। Right lobe left lobe. আমরা যখন শরৎকালের সাদা মেঘ ভর্তি আকাশের দিকে তাকাই তখন মস্তিষ্কের বাম ভাগ আমাদের আকাশের মেঘটাই শুধু দেখায়। অন্য কিছু দেখায় না। কিন্তু মস্তিষ্কের ডান ভাগ সেই মেঘকে নানান ডিজাইন করে দেখায়। কেউ দেখে হাতি, কেউ পাখি, কেউ মন্দিরের। কল্পনার ব্যাপারটা মস্তিষ্কের ডান ভাগের নিয়ন্ত্রণে। আমাদের মাথায় যদি ডান মস্তিষ্ক না থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু হামা-ভূত দেখতাম না। মস্তিষ্কের ডান অংশ আমাদের হামাভূত দেখতে সাহায্য করেছে।

প্রশান্ত বাবু বললেন, আপনার রাতের খাওয়া নিশ্চয়ই হয় নাই?

আমি বললাম, এখন খেয়ে নেব। সঙ্গে খাবার আছে। শুকনা খাবার।

প্রশান্ত বাবু বললেন, আমি রান্না বসাচ্ছি। আপনি আমার এখানে থাবেন। খিচুড়ি করব। ঘি দিয়ে খাবেন। আমি রাতে খাই না। আপনার জন্যেই রান্না করব। আপনি দয়া করে না বলবেন না। আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা ভালো রাধুনি হয়।

প্রশান্ত বাবু উঠানে রান্না বসালেন। আমি তাঁর পাশে মোড়া পেতে বসলাম। ভদ্রলোক বেশ গোছানো। নিমিষেই চুলা ধরিয়ে ফেললেন। চাল-ডাল হাঁড়িতে চড়িয়ে দিলেন। আমি বললাম, আপনি একা থাকেন?

প্রশান্ত বাবু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।

চিরকুমার?

না। বিবাহ করেছিলাম। স্ত্রী-পুত্র স্বর্গবাসী হয়েছে। আচ্ছা জনাব, আপনি তো অনেক কিছু জানেন- মৃত মানুষ কি ফিরে আসতে পারে?

আমি বললাম, প্রশ্নটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না।

তিনি বললেন, ধরুন কেউ একজন মারা গেল, তার কবর হলো বা দাহ হলো। বৎসর খানিক পরে সে আবার উপস্থিত। এ রকম কি হতে পারে?

আমি বললাম, গল্প-উপন্যাসে হতে পারে। বাস্তবে হয় না। কবর থেকে উঠে আসা মানুষদের বলে জম্বি। তারা মানুষ না। বোধশক্তিহীন মানুষ। তবে সবই গল্পগাথা। বাস্তবে কেউ কখনো জম্বি দেখেনি। সিনেমায় দেখেছে। জম্বিদের নিয়ে অনেক সিনেমা হয়েছে। আমি একটা ছবি দেখেছিলাম। সেখানে জম্বিরা পুরো একটা গ্রাম দখল করে নেয়। Return of the Dead.

প্রশান্ত বাবু বললেন, পরকাল থেকে মানুষ ফিরে আসার কোনো ঘটনা নাই?

আমি বললাম, ইংল্যান্ডের চার্চগুলি অঞ্চলের মানুষদের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখে। তাদের এক ক্যাথলিক চার্চে চারশ' বছর আগে মৃত মানুষের এক বছর পরে সংসারে ফিরে আসার ঘটনা উল্লেখ আছে। বিষয়টা নিয়ে তখন বেশ হৈচৈ হয়। তাকে পরিবারের সঙ্গে থাকতে দেয়া হবে না বলে চার্চ ঘোষণা দেয়। ইংরে রাজ পরিবারকে শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়।

তাকে কি পরিবারের সঙ্গে থাকতে দেয়া হয়েছিল?

না। সে তার স্ত্রী এবং দুই কন্যা নিয়ে অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। কোথায় যায় এই বিষয়ে কোনো তথ্য নাই। আপনার কাছে কি এই ধরনের কোনো গল্প আছে? পরকাল থেকে কেউ ফিরে এসেছে?

প্রশান্ত বাবু বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, না।

আমি বললাম, প্রশান্ত বাবু! মানুষ যখন সত্যি কথা বলে তখন চোখের দিকে তাকিয়ে বলে। মিথ্যা যখন বলে, চোখ নামিয়ে নেয়। পরকাল থেকে মানুষ ফিরে আসার ব্যাপারটা নিয়ে আপনার আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে আপনি এ ধরনের কোনো গল্প জানেন। আমাকে গল্পটা বলুন আমি চেষ্টা করব লৌকিক ব্যাখ্যা দিতে। অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে আমার ভালো লাগে।

আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর বলি। তবে আপনার কাছে আমি ব্যাখ্যা চাই না। ব্যাখ্যা ভগবানের কাছে চাই। আর কারো কাছে না।।

আমি খেতে বসলাম। অতি উপাদেয় খিচুড়ি। হালকা পাঁচফুড়ুনের বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘিয়ের গন্ধ। খিচুড়ি রান্নায় অস্কার পুরস্কার থাকলে প্রশান্ত বাবু দুটা অস্কার পেতেন।

আমি বললাম, গল্প শুরু করুন। প্রশান্ত বাবু অস্বস্তি এবং দ্বিধার সঙ্গে থেমে থেমে কথা বলা শুরু করলেন। ভাবটা এ রকম যে তিনি একটা খুন করেছেন। এখন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিচ্ছেন।

আমার বড় ভাইয়ের নাম বিকাশ ভট্টাচার্য। তাঁর স্ত্রী এক মাসের শিশুপুত্র রেখে একদিনের জ্বরে স্বর্গবাসী হন। আমার বড় ভাই পরম আদরে এবং যত্নে শিশুপুত্র লালন করতে থাকেন। আমরা কথায় বলি নয়নের মণি। আমার ভাইয়ের কাছে সত্যিকার অর্থেই তার পুত্র ছিল নয়নের মণি। সন্তান চোখের আড়াল হলেই তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। তার হাঁপানির টান উঠে যেত।

ছেলের যখন নয়। বৎসর বয়স তখন সে পানিতে ডুবে মারা যায়। ছেলেটার শখ ছিল বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পুকুর ঘাটে চলে যাওয়া। পানিতে চিল মেরে খেলা করা। দুপুরবেলা ভাই যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন সে পুকুরঘাটে খেলতে গিয়ে পা পিছলে মারা যায়।

সোমবার সন্ধ্যায়। তাকে সাজনাতলা শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়। আমার বড় ভাই উন্মাদের মতো হয়ে যান। চিৎকার করতে থাকেন— মানি না, মানি না। আমি ভগবান মানি না। ভগবানের মুখে আমি থুথু দেই! মানি না। আমি ভগবান মানি না।

তখন বৈশাখ মাস। ঝড়-বৃষ্টির সময়! তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। দাহ হয়ে গেছে। লোকজন চলে গেছে। আমার বড় ভাইকে ঘরে আনার অনেক চেষ্টা করা হলো। তিনি এলেন না। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বসে রইলেন এবং কিছুক্ষণ পরপর চিৎকার করতে লাগলেন, মানি না, মানি না—আমি ভগবান মানি না।

রাত তিনটায় তিনি শূন্য বাড়িতে ফিরলেন। শোবার ঘরে ঢুকে দেখেন— ঘরে হারিকেন জ্বলছে। খাটের উপর তার ছেলে বসে আছে। পা দুলাচ্ছে। আমার ভাই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পায় তাঁর জ্ঞান ফিরল। তখনো ছেলে খাটে বসা। ভাই বললেন, বাবা তুমি কে?

সে বলল, আমি কমল! আমি এসেছি।

কোথেকে এসেছ বাবা?

পানির ভিতর থেকে।

তুমি কি চলে যাবে?

বন।

আমার ভাই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু তিনি একটি ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। চারদিকে প্রচার করলেন- পুত্র শোক ভুলার জন্যে তিনি একটি কন্যা দত্তক নিয়েছেন। তিনি কমলকে মেয়েদের পোশাক পর্যালেন। তার নাম দিলেন কমলা।

গ্রামের লোক সহজেই বিশ্বাস করল। দু'একজন শুধু বলল, পালক মেয়েটার সঙ্গে মৃত ছেলেটার চেহারার মিল আছে।

আমি বললাম, ছেলেটা কি এখনো আছে?

হুঁ আছে।

কোথায়?

ভাইজান তাকে নিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে গেছেন। গৌহাটিতে থাকেন।

ছেলেটার কি মানুষের মতো বুদ্ধি আছে?

প্রশান্ত বাবু বললেন, না। দশ বছর আগে সে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। সে কোনো খাদ্য খায় না। দিনে-রাতে কখনো ঘুমায় না। রাতে পুকুরঘাটে বসে থাকতে খুব পছন্দ করে। হামা-ভূতের ভয়ে অনেকদিন পুকুরঘাটে যাওয়া হয় না।

আমি বললাম, আপনার বড় ভাইয়ের ছেলে তার বাবার সঙ্গে গৌহাটিতে থাকে। সেখানে হামা-ভূত গেল কিভারে?

প্রশান্ত বাবু চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, বারান্দায় দুটা মেয়েদের জামা শুকোতে দেয়া আছে। আপনি একা থাকেন। মেয়েদের জামা কেন? ছেলেটা কি আপনার?

প্রশান্ত বাবু বিড়বিড় করে বললেন, জে আর্জেন্তু, আমারই সন্তান।

কত বছর আগের ঘটনা। অর্থাৎ কত বছর আগে ছেলে ফিরে এসেছে?

একুশ বছর।

ছেলে আগের মতোই আছে। বয়স বাড়েনি?

প্রশান্ত বাবু জবাব দিলেন না। আমি বললাম, ছেলেটাকে ডাকুন। কথা বলি।

না। আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখলে সে ভয় পায়।

আমি বললাম, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা অত্যন্ত জরুরি। তার জন্যেও জরুরি। আপনার জন্যেও জরুরি।

প্রশান্ত বাবু বললেন, না। আপনার সঙ্গে গল্পটা করে আমি বিরাট ভুল করেছি। ভুল আর বাড়াব না।

আমি প্রশান্ত বাবুকে অগ্রাহ্য করে উঁচু গলায় ডাকলাম, কমল! কমল।

নয়-দশ বছর বয়েসি মেয়েদের পোশাক পরা এক বালক দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল। আমাকে এক পলক দেখে বাবার দিকে আসতে শুরু করল। প্রশান্ত বাবু কঠিন গলায় বললেন, ঘরে যাও। ঘরে যাও বললাম।

ছেলেটি ঘরের দিকে যাচ্ছে। এক পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, তার পায়ে কি সমস্যা?

প্রশান্ত বাবু কঠিন গলায় বললেন, তার পায়ে কি সমস্যা সেটা আপনার জানার প্রয়োজন নাই।

হামা-ভূত রহস্য ভেদ করার জন্যে আমি গ্রামে এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং-এর মর্যাদা পেলাম। আমাকে রেল স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে দুজন রওনা হলো। একজন মাথায় ছাতা ধরে রইল।

তাদের কাছে শুনলাম ছেলেটে পানিতে ডুবে মারা যাবার পর প্রশান্ত বাবুর খানিকটা মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। তিনি তার ছেলের চেহারার সঙ্গে মিল আছে এরকম একটা মেয়ে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এসে পালক নিয়েছেন। দিন-রাত মেয়েটার সঙ্গে থাকেন, কারো সঙ্গে মিশেন না। মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু মেয়েটা গিট্টু লেগে আছে, বড় হচ্ছে না। তাছাড়া ঠ্যাং খোড়া, সম্বন্ধও আসে না।

প্রশান্ত বাবু লোক কেমন?

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ভালো লোক। সমস্যা একটাই। মেয়ে ছাড়া কাউকে চিনে না।

যুগান্তর ১৩ মে, ২০০৯-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্ট
জলপরীদের দেশ থেকে দশ বছর পর ফিরে এলো মাসুদ
এমরান ফারুক মাসুম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে

পানিতে ডুবে যাওয়ার ১০ বছর পর অলৌকিকভাবে জলজ্যান্ত মায়ের কোলে ফিরে এসেছে মাসুদ (১৪) নামের এক শিশু। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনাটি ঘটেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের রামজীবনপুর গ্রামের কাচারীবাড়িতে। এলাকাজুড়ে জোর গুজব, মাসুদ এতদিন ছিল জলপরীদের দেশে। সেখানে সে জীবনযাপন করেছে অলৌকিকভাবে। জলপরীরাই তাকে লালনপালন করেছে এতদিন। ছেলেটিকে নিয়ে নানাজনের মুখে নানা কথা ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র এলাকায়। জানা গেছে, সদর উপজেলার রামজীবনপুর গ্রামের কাচারীবাড়ির মৃত মাহতাবউদ্দিনের ছেলে মাসুদ (৫) ১৯৯৯ সালে তার ভাই-বোনদের সঙ্গে মহানন্দার রামজীবনপুর ঘাটে গোসল করতে গিয়ে ডুবে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাসুদের কোন সন্ধান না পেয়ে মা শেফালী বেগম বুকে পাথর বেঁধে দিন কাটান। অবশেষে ১০ বছর পর গত ৮ মে শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে অলৌকিকভাবে মহানন্দা নদীর কল্যাণপুর ঘাটের কাছে মাঝনদাঁতে সে ভেসে ওঠে।

কল্যাণপুর মহল্লার ইলিয়াস আহমেদের স্ত্রী রানী বেগম জানান, তিনি গত ৮ মে। শুক্রবার দুপুরে নদীর ঘাটে গোসল করতে যান। গোসল করার সময় মাঝনদাঁতে ছেলেটিকে পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখতে পেয়ে সেখানে কয়েকজনের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসেন। নদী থেকে তোলার সময় একটি ৫ বছরের শিশুর মতোই সে আচরণ করছিল।

শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে আসার পর রানী বেগম স্থানীয় লোকজনকে ঘটনাটি জানান। শিশুটি কোন কথা বলতে না পারার বিষয়টি বিভিন্নভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে শিশুটিকে দেখতে আসেন রামজীবনপুর গ্রামের কাচারীবাড়ির শেফালী বেগম। শেফালী বেগম সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই উদ্ধারকৃত শিশুটি শেফালীকে জড়িয়ে ধরে। এ সময় শেফালী বেগম তাকে তার ছেলে বলে শনাক্ত করেন। ছেলেটির কোমরে একটি পোড়া দাগ দেখেই তাকে শেফালী বেগমের ছেলে বলে স্থানীয় লোকজন শনাক্ত করেন।

উদ্ধারের পর থেকেই মাসুদ মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত রানী বেগমের হেফাজতেই ছিল। অবশেষে মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানায় তাকে নিয়ে আসা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমানের উদ্যোগে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহসানুল হক ছেলেটিকে বালিয়াডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল হাইয়ের উপস্থিতিতে তার মা শেফালী বেগমের কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া মাসুদকে একনজর দেখার জন্য হাজার হাজার লোক ভিড় জমায়।

১৯৯৯ সালে শিশু মাসুদ মহানন্দা নদাঁতে ডুবে যাওয়ার সময় তার বয়স ছিল ৫ বছর। শুক্রবার মাসুদকে উদ্ধার করার পর থেকে তার শারীরিক গঠনও অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি

পেতে থাকে এবং এই ৫ দিনেই সে এখন বেড়ে ১৪ বছরের এক বালক। বালক মাসুদের আচার-আচরণ অস্বাভাবিক। সে কোন কথা বলতে পারছে না। কোন খাবারও খেতে পারছে না। মাঝে মাঝে তার গলা থেকে পানির জীবজন্তুর মতো অস্ফুট শব্দ বের হচ্ছে।